বহ্নিলতা / অমর মিত্র

এক

গাঙের উপরে মেঘ উঠলে গাঙের যেমন রঙ হয়, বালিকা তেমনি। বনের উপর মেঘ উঠলে বনে যেমন ছায়া ঘনায়, বালিকা তেমনি। বনের দিকে চোখ মেলে দিলে যেমন বুক ঝিমঝিম করে, মেয়ে তেমন-ই। তার নাম লতা। বনলতা, সুন্দরবনের লতা। ভালবেসে জড়িয়ে থাকে, আঁকড়ে থাকে। সুশান্ত আর বহ্নিশিখা তার নাম দিয়েছিল বহ্নিলতা। বহ্নিলতা মৃধা। সুশান্তর স্ত্রী বহ্নিশিখার সঙ্গে লতার মতো জড়িয়ে থাকা মেয়ে। অগ্নিলতা, বহ্নিলতা দেখেছিল তারা পুরুলিয়ার কোন এক শৈলশ্রেণীর গায়ে বসন্ত কালে। কাঠুরেরা কাঠ কাটতে আদিবাসীরা শিকার করতে পাহাড়ি পথ তৈরি করতে, কাঠ কয়লা সংগ্রহ করতে আগুন লাগিয়ে দেয় পাহাড়ের গায়ের বনভূমিতে। অনেক সময় শুকনো পাতার ঘষাঘষিতেও আগুন লাগে। দাবানল। সেই আগুন অনেকদিন ধরে জ্বলে। লতার মতো লতিয়ে ওঠে পাহাড়ের গায়ে। সেই অগ্নিরেখা তাদের, সুশান্ত আর বহ্নিশিখাকে অবাক করেছিল। ্মুক্তির রেখা যেন। মানুষের মুক্তি হবেই। বহ্নিলতাকে নিয়ে আবার সেই যৌবনের আগুন যেন ফিরে এসেছিল তাদের নীরক্ত পরাস্ত জীবনে। অগ্নিলতা। সেই বহ্নিলতার বনলতা নামটি দিয়েছিল তার ঠাকুদ্দা নিতাইহরি। শ্রীহরির কাছে সমর্পিত নিতাইহরি বাংলাদেশের সাতক্ষীরের নিকটবর্তী বড়দলের বাসিন্দা ছিল। সেখানে কপোতাক্ষ নদ। সেই কালে সেই নদে স্টিমার চলত। বহ্নিলতা সব জানে। কী করে জানে? তার জন্ম তো ১৯৯৫-এ। ৯৫-এর এক বসন্তদিনে, ফাগুন মাসে, যখন বনে বনে ফুল ফুটেছে, সে মা পুষ্পরানির কোলে এসেছিল। সেই ফাগুনেই তাদের ভিটের পিছনে মস্ত আম গাছটিতে বড় এক চাক হয়েছিল মধুর। ভিনদেশি মৌমাছিরা চাক বেঁধেছিল। সেই মধুর ভিতরে যে ফুলের গন্ধ পেয়েছিল ঠাকুরদা নিতাইহরি, তা নাকি তাদের দণ্ডকারণ্যের সেই গ্রাম বিরামপুরার পাহাড়ে ছিল। বড় গাছে বড় বড় ফুল, ঠাকুরদা বলত হরির দেওয়া হরিপুষ্প। মৌমাছিরা ঘুরে ঘুরে এসেছিল সেই উষরভূমি, নিদয়া অহল্যাভূমি থেকে। তারা ফুলের কাছে আসার আগে মানষের কাছে আসে। গুনগুন করে বহ্নিলতা......

পতঙ্গ হইতে হইল মধুর জনম
মধু পেইয়ে তুষ্ট হইল
যতো দেবগণ।
মধুর মতন আর মধু নাহি ভবে
মধু লাগে সর্বদেব
দেবীর উৎসবে।

সেই বছর তাদের দুবিঘে জমির ধান নষ্ট হয়নি ঝড়-বৃষ্টিতে। অঘ্রানের ধান সবটাই ঘরে উঠল, শীতের সব্জি, পালং আর ফুলকপি হয়েছিল অনেক। বাবা মাঝে মাঝে নাও নিয়ে গহীন গাঙে চলে যেত, ভাল মাছ পেত। বিক্রির পর ঘরের জন্য কিছু রাখত। লইট্যা মাছ, আমাদি মাছ, চিত্রে মাছ, গাঙ-ভেটকি...গর্ভবতী মা খেতে পেত। সেই বছর সংসারে সুখ এসেছিল। সুখ এসেছিল সে মায়ের পেটে আসার পর। কবিতা-বহ্নিলতা শুনেছে সব কথা তার মায়ের কাছে। আরো কথা শুনেছে তার বাবার কাছে। আরো কথা তার ঠাকুরদার কাছে। ঠাকুরমার কাছে। ঠাকুরদা নিতাইহরি পারটিশনের সময় ওপার থেকে চলে এসেছিল। ওপারে তাদের তেমন কিছু ছিল না, আর ঘর পুড়েছিল দাঙ্গায়। তখন বহু মানুষ দেশত্যাগ করছিল, তারাও ছেড়ে এসেছিল বাঁকা-ভবানীপুর। কপোতাক্ষ নদ সেখানে বেঁকেছিল অষ্টমীর চাঁদের মতো করে।

তুই এত কথা জানলি কী করে লতা ? সন্ধ্যে বহ্নির সঙ্গে কথা হয় বহ্নিলতা কবিতার। তখনো সুশান্ত ফেরেনি তার প্রকাশনা থেকে। ফিরতে তার রাত হয়। বহ্নিশিখা প্রাইমারি ইস্কুলে পড়ায়, বিকেলের আগেই ফিরে আসে। তিন ঘন্টা পড়ানো, দু'ঘন্টা মিড-ডে মিল। বাচ্চারা সব গরিব মা বাপের। ভাত না পেলে ইস্কুলে আসতই না।

লতা বলে, আমি যেন সব দেখেছি মনে হয় মা।

মা ডাকটি শুনলে বুক জুড়োয় বহ্নিশিখার। কিন্তু সুশান্ত তার পিসে। সুশান্তই বলেছে, তুই পিসে বলতে পারিস, মেসো বলতে পারিস, জেঠা, কাকা বলতে পারিস। বাবা নয়।

বাবা নয় কেন? আহা, বহ্নিলতার বাবা তো রয়েছে সেই সাত নদী পেরিয়ে মথুরগঞ্জে। ওরা খুব দুঃখ পাবে। ভাববে ওদের মেয়েকে আমরা নিয়ে নিয়েছি সারা জীবনের মতো।

দেশভাগ হলে যুবক নিতাইহরি চলে আসে এপারে। এপারে এসে কিছু করতে না পেরে চলে গিয়েছিল দণ্ডক অরণ্যে। সেখানে জমি পেয়েছিল, কিন্তু সে জমিতে চাষ হতো না। পাথর পাথর। পাথর ভেঙে ভেঙে নিতাইহরি অকালে বুড়ো হয়েছিল।

সে তুমি ভাবতে পারবে না মা, জল নাই, জলের কী অভাব, অনেক দূরে একটা ঝর্না ছিল, তা নদী হয়ে নেমেছিল নিচে, সেই জল ভরসা, জলকে ওদেশে পানি বলে, আমার ঠাকমা পানি আনতে যেত কলসি নিয়ে, আমার বাবাও পানি টানত, ইঁদারার জল শুকিয়ে যেত মাঘ মাস থেকে, টিনের বাড়ি কী গরম হতো গরমের সময়, সে খুব কঠিন দেশ ছিল মা।

কঠিন দেশ, কে বলেছিল এ কথা ?

আমার বাবা, কঠিন বটে, পানি নাই, ছায়া নাই, পাহাড় দেখা যেত অনেক দূরে, নীল পাহাড়।

বহ্নিশিখা বলে, তুই এমন ভাবে বলিস, যেন তুই সব দেখেছিস।

হাসে কালো মেয়ে, বলে, হ্যাঁ গো মা, আমার মনে হয় আমি দেখেছি সব, সেই বিরামপুরা, সে দেশে কাঁটাল হয় ভালো, আমাদের ভিটেয় কাঁটাল গাছের ছায়া ছিল, ছায়ায় বসে ঠাকমা বলত সেই বাঁকা গাঁয়ের কথা, কপোতাক্ষ নদের কথা, কপোতাক্ষ নদের ধারেই তো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম, কবি মাইকেল মধুসূদনের জন্ম, আমিও জন্মাতাম সেখেনে যদি না ঠাকুরদা চলে আসত, সেই গাঙের জন্যি আমার মন কেমন করে মা, সত্যি বলছি।

কী কথাই বলে বহ্নিলতা। শুনলে প্রাণ জুড়োয়। যে নদী যে গ্রাম সে দ্যাখেনি, তার জন্য তার মন খারাপ হয়। সেই বিরামপুরার জন্যও মন খারাপ লাগে। মা, সেই যে নীল পাহাড়, তা নাকি চিত্রকূট, সে দেশ নাকি রামায়ণের দেশ। রামের বনবাস হয়েছিল সেই দেশে।

তোর ঠাকুরদা তাহলে চলে এল কেন? জিজ্ঞেস করেছিল বহ্নিশিখা।

ও মা, কেন আসবে না, খুব কষ্ট যে, আমরা আস্তে আস্তে ওদের মতো হয়ে যাচ্ছিলাম, আমাদের মতো থাকছিলাম না, ঠাকমা কাঁদত তার গাঙের জন্যি, বৃষ্টির জন্যি, সে দেশে এত কম বৃষ্টি হয়!

আমাদের দেশের মতো এত জল, পুকুর নদী, নরম মাটি আর কোথায় পাবে বল, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

হুঁ, কিন্তু ঠাম্মা যে সেই কঠিন মাটির বিরামপুরার জন্যও মন খারাপ করত, উঠনে দাঁড়িয়ে নীল পাহাড় দেখা যেত, ঠাম্মার মায়া পড়ে গিইছিল সে দেশের জন্যিও। বহ্নিলতা, লতা।

নিতাইহরির ছেলে বলাইহরি বাপ মাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল মরিচ ঝাঁপি। তখন বলাই বছর পনের। বছর পনেরতেই সে বলশালী। বলেছিল, পোড়ার দেশে থাকব না। মরিচঝাঁপিতে মার খেয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এক দ্বীপে। নাম জানে না। সাপে কেটে মরেছিল কতজন। এক মাঝি তাদের উদ্ধার করে গাঙ পার করে হ্যামিল্টন গঞ্জ, যোগেশগঞ্জ হয়ে সেই দ্বীপে নিয়ে যায় যেখানে যে মথুরগঞ্জে কবিতা জন্মেছিল। কবিতার মা পুষ্পরানি দু বছর বয়সে মথুরগঞ্জে এসেছিল বরিশাল থেকে গাঙে ভেসে ভেসে। সেই গাঙের একুল নেই ওকুল নেই। সমুদ্রে বিলীন হয়েছে তা আরো দক্ষিণে গিয়ে। তখন যুদ্ধ চলছিল, মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে তারা আর ওপারে ফিরে যায়নি। তো সেই মথুরগঞ্জ থেকে পুষ্পরানি ও বলাইহরির কিশোরী মেয়েটি কাজ করতে এসেছিল কলকাতা। সুশান্ত আর বহ্নির পুরোন বাড়িতে। বাড়িটি পাঁচ কাঠা জমিতে। পূর্ববঙ্গ থেকে এসে সুশান্তর বাবা কোনো রকমে খাড়া করেছিলেন। সুশান্তর দাদা বহুদিন ইংল্যান্ডে। এদেশে আসেন না। দিদি দিল্লিতে সেটলড। বহ্নিদের বাড়ি ছিল বেহালা। মা বাবা দুজনের কেউ নেই। দুই ভাই ভাগ করে নিয়েছে বাড়িটি। বহ্নি জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেছিল তার জন্য কিছু নেই। ভাইরা ভেবেছিল বোন আর ফিরবে না। ঘর থেকে যে মেয়ে বেরিয়ে গেছে, সে ফিরে এলেও গ্রহণ করবে কীভাবে? তারা ভুত দেখেছিল। পরিষ্কার বলেছিল, বহ্নির জন্য তাদের সামাজিক সম্মান গেছে। আর এখন যে জমানা, সেখানে ভুয়ো বিপ্লবীদের কোনো জায়গা নেই। দয়া করে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বামপন্থী সরকার না এলে জেলেই পচে মরত তারা। বহ্নি বাড়ির ভাগ পাবে না। কিছুই পাবে না। তারা সরকারী দলের ঘনিষ্ঠ। বহ্নি কিছুই করতে পারবে না। বহ্নির উচিত ছিল একটা বর জুটিয়ে নেওয়া। পারেনি যখন, তাদেরও দায় নেই। থানায় গিয়ে লাভ নেই। থানা তাদের মান্য করে, কেন না তারা শাসক দলের অনুগ্রহ পায়। বিপ্লব হয়ে গেছে। চতুর্দিকে শান্তি বিরাজমান। কথা না বলে বহ্নি তখন সুশান্তর কাছে ফেরে। সুশান্ত তাকে বলেছিল, চলে এস। আমাদের কাজ ফুরোয়নি।

কাজ ফুরোয়নি বলেছিল বটে, কিন্তু কাজটি কী তা দুজনের কেউ ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কাজটি কী তা তখন যেন জানেই না। সব ছিন্নভিন্ন। বিপ্লবের স্বপ্ন ফুরিয়েছে কিংবা চাপা পড়ে গেছে। তারা ম্যারেজ রেজিস্টারকে নোটিস দিয়ে বিবাহ যাত্রা করেছিল। বিবাহ না করে এক বাড়িতে বসবাস করে কী করে? পুরোন দুই কমরেড এসেছিল এন্টালি আর খিদিরপুর থেকে। সাক্ষী হয়েছিল সেই ঘটনার। তারা তারপর তারা, সেই দুই কমরেড কোনো দিক খুঁজে না পেয়ে

তদানীন্তন শাসক দলের হয়ে কাজ করতে লাগল। এখন আবার দল বদল করেছে। কাউন্সিলার। তাদের সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই।

বিবাহর পর সন্তানের জন্য বসেছিল দুজনেই। একটি শিশুর মুখ দেখবে। তাকে বড় করবে। তখন একটা কাজ হবে। সুশান্ত 'সংক্রান্তি' পত্রিকা আবার বের করার কথা ভাবছিল। অতনু কোথায় কে জানে। অতনুদের বেলগাছিয়ার বাসাবাড়িতে সে খোঁজ নিতে গিয়েছিল। ১৯৮৫ সাল। পায়নি। তাদের পরিবার ভাড়াবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। সুতরাং একা একা 'সংক্রান্তি' বের করার কথা ভেবেছিল সুশান্ত। তখন আয় ছিল না কারোর। টিউশনি আরম্ভ করে দুজনেই। বহ্নিশিখা চাকরির চেষ্টা করতে থাকে। খুব কষ্টে গেছে অনেকদিন। তারপর বহ্নিশিখা পায় প্রাইমারি ইস্কুলের চাকরিটি। কমরেডরা সবাই যে যার মতো করে তখন জীবনে প্রবেশ করেছিল। তারা পারেনি। কাজ ফুরোয়নি। কিন্তু কাজটি কী তা বুঝতে পারছিল না। তাদের বয়স হয়ে গিয়েছিল। সন্তান হয়নি। বাড়িতে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল যেন দুজনে। সেই সময় হাসনাবাদের কমরেড বিশ্বনাথ গায়েন তাদের কাছে নিয়ে এসেছিল লতাকে। সুন্দরবনের অভাবী ঘরের মেয়ে। দশ বছরের মেয়েকে পড়া ছাড়িয়ে কাজে দিতে চায় বাবা মা। বছর বছর বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে ধান নষ্ট করে। অভাব যায়ই না। মেয়েটা পারবে। দেখ না সুশান্ত, বাসন মাজা রান্না করা---সব জানে। নেবে? মথুরগঞ্জের লতা, বনলতা। গরিব চাষি ঘরের মেয়ে, তোমার ঘরে দুটো খেতে পাবে তো।

বাবার নাম বলাইহরি। মেয়ে কবিতা। শীর্ণকায় বলাইহরি কী এক সঙ্কোচে নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে। বসতে বললেও বসছিল না। শ্যাম বর্ণের বালিকাটি অবাক চোখে সুশান্ত আর বহ্নিকে দেখছিল। সুশান্ত আর বহ্নির মনের ভিতরে ঝড় উঠেছে তখন। কমরেড! কবে নাগাদ সুফল ফইলবেক? দোবেলা ভাত হবেক? আপন আপন জমিন হবেক, কমরেড আর কত দিন?

সেই অপ্রস্ফুটিত বনের ফুল, বালিকার গা থেকে গাঙের পানির নোনা গন্ধ ভেসে আসছিল। তিনটে গাঙ পেরিয়ে হাসনাবাদ এসে ট্রেন ধরে দমদম এসে আবার ট্রেন ধরে বেলঘরিয়া। বিশ্বনাথ বলল, সুশান্তদা, এদের আমি চিনি, মরিচঝাঁপি থেকে এসে খুব মার খেয়েও আর ফিরে যায়নি, দম খুব, বলে নাকি মরিচঝাঁপির সময় পুকুরে ডুব দিয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি লুকিয়ে ছিল এর ঠাকুরদা আর বাবা, অন্ধকারে বেরিয়ে এসেছিল পুলিশ চলে যাওয়ার পর, মেয়েটাকে বুঝিয়ে দিও, সব কাজ পারবে।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে সুশান্ত সব ভুলে গিয়েছিল। গাঙে ভাসতে ভাসতে এল নাকি এই বুনো লতা? চোখদুটি দেখ, চোখের ভিতরে যেন গাঙের ছায়া। ভাসিয়ে রেখেছে জলের উপর। বসতে বললে সে মেঝেয় বসে তার মসৃণতায় হাত বুলোতে লাগল। এমন পাকা ঘরে সে এই প্রথম। চোখের পলক পড়ছিল না যেন। সুশান্ত কিছুদিন ছিল সুন্দরবনে। সেখানে তার পিছনে ছায়ার মতো থাকত এক লখাই মৃধা। লখাইয়ের সঙ্গে এ দ্বীপ ও দ্বীপ করেছে কম না। সংগঠিত করছিল গরিব মানুষকে। কিন্তু সে কাজ যে কত কঠিন। কারোর সময়ই হয় না। কাজ ফেলে আসে কে? হয় গাঙে গেছে, না হয় খাটতে গেছে, না হয় ভুখে আছে। লখাই জিজ্ঞেস করেছিল, কতদিন লাগবে কমরেট?

লাগবে, তুমি কার বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করেছ তা জানো ? সুশান্ত বোঝাতে চেয়েছে।

মহেশখালির বিন্দাবন মন্ডল, জানি। লখাই বলেছিল, তার ঘরে দুইটা বন্দুক আছে কমরেট।

যুদ্ধ শুরু হবে, ন্যায় যুদ্ধ, ভাতের লড়াই। সুশান্ত আর কোনো কথা খুঁজে পায়নি। কথার বড় আকাল। লখাইয়ের জন্য অন্য রকম কথা চাই, বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সেই কথা তার ঝুলিতে নেই। লখাই বলেছিল, যুদ্ধু, আমাদের না আছে পানসি, না আছে নৌকো, গাঙে ডুবায়ে মারবে। তাইই হয়েছিল মরিচঝাঁপি ফেরত মানুষের। সে আরো ক'বছর বাদে। লখাই বলেছিল, মেরে লাশ গাঙে ভাসাই দিলি, মাছেই খেয়ে নেবে, মহেশখালির বিন্দাবন অমন করেছে ক'বার, তার ভিতরে একটা কামিন মেয়ে ছিল।

মহেশখালি কোথায়? তিন দ্বীপ পার হয়ে আর এক কোন দ্বীপ ? শুনতে শুনতে সুশান্ত তার কথা বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। আর কতদিন কমরেট? কতদিন তা সে জানত না। এখনো জানে না। মনে হয় এ জীবনে আর নয়। পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। হ্যাঁ, আর কতদিন! ক্ষুধা যে সর্বগ্রাসী। কতদিন খালি পেটে বসে থাকা যায়! সব মনে পড়ে যায়!

চেলিয়ামার কুরচি দাস, পারার নন্দিন মাহাতো, জয়চন্ডী পাহাড়ের কোলের চিন্তামণি, অহল্যারা ফিরে এল বহ্নিশিখার মনে। তাকে পুলিশ তুলেছিল জামদা থেকে। মানবাজার জামদার এক খোঁচড় খবর দিয়েছিল। সে-ও পার্টির ছিল। কিন্তু লোভ তাকে খেয়েছিল। সে ছিল অভাবের দিন। না খেয়ে থাকা অভ্যেস করছিল বহ্নি। কিন্তু সে অভ্যাস তো নতুন। ক্ষুধার চেয়ে বড় কিছু নেই। সে চেষ্টা করে যাচ্ছিল অভ্যাস বজায় রাখতে। কিন্তু তারা হতে দেবে না। দিদির জন্য ভাত জুটিয়ে আনত কুরচি, অহল্যা, বেহুলারা……, আহা! কতদিন বাদে তাদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার? তারা জেল থেকে বেরিয়ে

কোথায় গেছে? বেঁচে আছে তো নন্দিন মাহাতো? রক্ত করবীর নন্দিন নাম দিয়েছিল সে। কী বুদ্ধি ছিল মেয়েটার। আসল নাম ছিল পার্বতী। তার একটা বোন ছিল, লক্ষ্মী মাহাতো। এমন বয়স। সে এল নাকি?

আয় আয়, আয় বস, মাটিতে কেন, ওই চেয়ারে বস, সবাই বসুন, কী নাম তোর মেয়ে?

লতা, বনলতা, তুমার নাম, ও মা? সে আলটপকা জিজ্ঞেস করেই মুখ নামিয়েছিল।

মা……। বহ্নি চুপ করে তাকিয়েছিল মেয়ের দিকে। এইটুকু মেয়ে, কী কাজ করবে? একে দিয়ে কাজ করাতে পারবে তারা? বাসন মাজবে, ঘর মুছবে, আর তারা পায়ের উপর পা রেখে চায়ে চুমুক দেবে? বিপ্লব হয়নি, তাই এমন হতেই পারে। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে, তাই এমন হতে পারে।

দুই

আমি অতনু। সুশান্ত আমার কলেজের বন্ধু। কেমিস্ট্রি অনার্স। আমাদের কলেজ ছিল স্কটিশ চার্চ। হেদুয়ার পিছনে। কী শান্ত তার পরিবেশ। সাহিত্য, নাটক, গান---নানা চর্চা নিয়ে আমাদের কলেজ ছিল বিখ্যাত। কেয়া চক্রবর্তী ইংরিজি পড়াতেন। বোটানিতে পড়ত একটি মেয়ে, সে তখন অরুন্ধতি দেবীর ছবিতে অভিনয় করে বিখ্যাত। আমাদেরই বয়সী। কী অদ্ভুত লাগত, রোমি চৌধুরী আমাদের কলেজের ছাত্রী! মিঠুন চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ মনে হয় বোটানি অনার্স পড়ত। পরে তার ভারতজোড়া নাম হয়েছিল। মৃগয়া সিনেমা দেখতে দেখতে মনে পড়েছিল আমাদের স্কটিশের সহপাঠী। আমাদের সময় ছিল ১৯৬৮-৭২। তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চার বছরের হয়ে গিয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলন, বিদ্রোহ, পাল্টা যুব শক্তির আবির্ভাব পরীক্ষা পিছিয়েই দিচ্ছিল ক্রমাগত। আমি আর সুশান্ত একটা দু-ফরমার পত্রিকা বের করেছিলাম, তাতে গল্প লিখেছিলাম আমি, সুশান্ত কবিতা। প্রবন্ধ ছেপেছিলাম বাংলার বিখ্যাত এক অধ্যাপকের। কিন্তু আমরা দুজনেই কেউ সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম না। ক্লাসের বন্ধুরা হেসেছিল। কেউ কেউ বলেছিল, বাংলা অনার্সে গিয়ে ভর্তি হতে। হ্যাঁ, সুশান্ত আমার সমুখেই বদলে যাচ্ছিল। মুখচোখ কঠিন হয়ে যাচ্ছিল ওর। আমি বুঝতে পারছিলাম সুশান্ত বিপ্লবী পার্টিতে ঢুকে পড়েছে। নক্সালবাড়িতে গুলিতে কৃষক হত্যার পর কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী অংশ বেরিয়ে এসেছে বছর দুই আগে। সেই কথাই ছিল সুশান্তর কথা। সে বদলে যাচ্ছে। বলছিল, এই সিস্টেম ভাঙতেই হবে, এই শিক্ষার কোনো মূল্য নেই , মানুষের মুক্তির জন্য গ্রামে যেতে হবে অতনু, তুই গ্রাম দেখেছিস, সাঁওতাল পরগণা? আদিবাসী গ্রামে যাবি আমার সঙ্গে? পিকিং রেডিও বলেছে ভারতে শোনা গিয়েছে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ। বিপ্লবের গান। চারুবাবু।কানু সান্যাল, খোকন মজুমদার, চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। আর সেই গান, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বজ্র-গম্ভীর কন্ঠস্বর……

জন হেনরি জন হেনরি
নাম তার ছিল জন হেনরি
ছিল যে জীবন্ত ইঞ্জিন
হাতুড়ির তালে তালে গান গেয়ে
শিল্পী খুশি মনে কাজ করে রাতদিন
কালো পাথরে খোদাই জন হেনরি।
……………………………………………..

সুশান্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল বিপ্লবের ডাক শুনে, অতনুর মনে আছে তা। ফিরেছিল নিঃস্ব হয়ে। কাজ ফুরোয়নি বলে বহ্নিশিখাকে ডেকেছিল বটে সুশান্ত, কিন্তু ফুরিয়েছিলই তো। কী আর কাজ পড়ে থাকে পরাজিত মানুষের জন্য? পার্টি নেই। থাকলেও টুকরো টুকরো, সবাই এক একটি দল। তাদের কাজ পরস্পরে পরস্পরকে দোষারোপ করা। রাজ্যে যে শাসন চলছে তা নিয়ে সবাই খুশি। অপারেশন বর্গা করে গ্রাম শান্ত করা গেছে। বড় বড় চাষীরা কৌশলে দল বদল করে নিয়েছে পরে। নিজেদের জমির বর্গাদারকে চুপ করিয়ে রাখতে পেরেছিল ধর্মের ভয় দেখিয়ে। বাবুর জমিতে বর্গা করা অধর্ম তো নিশ্চয়। তখন বুদ্ধিমান পঞ্চায়েত ছোট ছোট জোতের চাষীর জমিতে কৌশলে বসিয়ে দিচ্ছে বর্গাদারের নাম। কিন্তু সব তাও নয়। বড় জোতের মালিক তো প্রথমে ভয় পেয়েছিল সত্য। সমঝোতা করতে সময় লেগেছিল। তখন যেন চারদিকে শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে। মৃদু মন্দ মলয় বাতাস। সুশান্ত আর বহ্নির কিছু করার ছিল না। বেশ কয়েক বছর বসে থেকে, টিউশনি করে বেঁচে থেকে শেষমেশ সুশান্ত একটি পাবলিকেশন করে। পত্রিকা করে। সেই পত্রিকা যেটি সে প্রথম জীবনে

প্রকাশ করেছিল অতনুর সঙ্গে। অতনু জানত না, তাদের সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া পত্রিকা ‘সংক্রান্তি ’ আবার বের করছে সুশান্ত। সম্পাদক বহ্নিশিখা রায়। প্রকাশক সুশান্ত রায়। পরে যুক্ত হয়, কর্মসচিব বহ্নিলতা মৃধা। ঠিকানাঃ......।

অতনুর জানার উপায় ছিল না। সে কবেই লেখা ছেড়ে দিয়ে মন দিয়ে সংসার করেছে। দুই সন্তান। মেয়েকে বড় করেছে। বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে কর্পোরেট পাত্র সংগ্রহ করে। ছেলে দিল্লিতে সেটলড। এখন স্বামী স্ত্রীর কিছু করার নেই। দুজনেই রিটায়ার করেছে সদ্য। বছরে তিনবার বাইরে যায়। কখনো পুরুলিয়ার অযোদ্ধা পাহাড়। কখনো রাজস্থানের মরু অঞ্চল। কখনো যায় দিল্লি হয়ে মুসৌরী দেহরাদুন। দিল্লিতে ছেলে আর ছেলের বউ, নাতনি। এই ভাবে কেটে যাবে জীবন। এ জীবন যে স্বপ্ন নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল তা আরম্ভেই বিনষ্ট হয়েছিল। ‘সংক্রান্তি’ বন্ধ। লেখা কেউ ছাপে না। আগ্রহ চলে যায় ক্রমশ। রিটায়ার করে একবার চেষ্টা করেছিল। সফল হয়নি তা। কে যেন বলেছিল সে গাড়ি বহুদূর চলে গেছে। তবুও অতনু তৃপ্ত। জীবনের বড় দুই কাজ, দুই সন্তানকে বড় করে প্রতিষ্ঠা দেওয়া, তা হয়েছে। বড় ফ্ল্যাট হয়েছে। খুব শীগগির যাবে ইউ,এস,এ। দেখে আসবে অতুল বৈভবের দেশ। নায়াগ্রার গর্জন শুনে আসবে। গ্রান্ড ক্যানিয়ন, হলিউড---মেয়ে মুনাই--অদ্রিজা গল্প করে ভিডিও আলাপের সময়। তারা শনিবার বেরিয়ে পড়ে লং ড্রাইভে। স্বপ্নের মতো কথা সব।

হ্যাঁ, সুশান্তর কথা হোক। আমি অতনু বলছি সুশান্তর কথা। আত্মগোপন করা সুশান্ত হঠাৎ একদিন আমার বাড়ি এসেছিল দুপুরে, ছুটির দিনে। তার আগে সে কলেজে আসা ছেড়েছিল। কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি ভেঙেছিল। কেমিস্ট্রির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এ, বি,--অপরেশ ভট্টাচার্য স্যার বলেছিলেন, তোমাদের বন্ধু, সুশান্ত দত্ত, এই কাজ করল কেন, জীবনটা নষ্ট করবে?

অপরেশ ভট্টাচার্য স্যারের কথা মনে পড়ে সুশান্তর। মোটা গোফ, ধুতি পাঞ্জাবি। ভালবাসতেন ছাত্রদের নিজের সন্তানের মতো। কে না খেয়ে নটার ক্লাস করতে এসেছে উত্তরপাড়া থেকে, তাকে মানিকতলায় নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভাত খাইয়ে এনেছেন। তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। চোখ ছলছল করছিল প্রবীণ মানুষটির।

আমার সঙ্গে দেখা হয়নি অনেকদিন স্যার। অতনু বলেছিল।

ও ফার্স্ট ক্লাস পেতই, ল্যাবরেটরিটা কত দিন ধরে সাজিয়েছিলাম আমি, ধ্বংস করে দিল! কন্ঠস্বর বুঁজে গিয়েছিল স্যারের।

অপরেশবাবু আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই ভাবে বিপ্লব হতে পারে কি না, আমি কি সমর্থন করি বিপ্লবীদের এই কাজ ?

চুপ করে ছিলাম। কী বলব? বিপ্লব মানে কি ল্যাবরেটরি ধ্বংস? আমরা শিখব না রসায়নের ম্যাজিক?

সুশান্তর সঙ্গে যদি দেখা হয় জিজ্ঞেস করো। অপরেশবাবু বলেছিলেন।

ইয়েস স্যার।

ওকে সাবধান হতে বলো, পুলিশ কতবার জেরা করেছে আমাকে, জিজ্ঞেস করেছে, আমি বলতে পারিনি ওর নাম, ও ভুল করেছে, জীবন কিন্তু সহজ নয়, বিপ্লব এইভাবে হয় কি না আমি জানি না, অনুতাপ করতে হবে একদিন। অপরেশবাবুর চোখ আর্দ্র হয়ে এসেছিল।

সুশান্ত আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ত্রিকোণ পার্কটিতে। বাতাস তখন গরম হচ্ছে। শীত চলে গিয়ে বসন্ত তার উজ্জ্বল মুখ দেখিয়েছে। রোদের ভিতরে গ্রীষ্মকাল, ছায়ায় শীত। সুশান্ত বলেছিল, গ্রামে চলে যাচ্ছে সে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরবে। মুক্তির স্বপ্নে তার দুচোখ ভেসেছে তখন অকুল দরিয়ায়। সুশান্ত বলেছিল, যদি বিপ্লব হয়, মুক্তি হয়, আমি ফিরে আসব, দেখা হবে অতনু, তুই শহরে থেকে কী লিখবি, গ্রাম ভারত না চিনলে কী ভাবে লিখবি ?

সুশান্ত আর অতনু যে ম্যাগাজিন বের করত ‘সংক্রান্তি ’, সেই ম্যাগাজিনে অতনু আচার্যর লেখা বের হয় প্রথম। সুশান্ত সত্যিই চলে যাচ্ছিল শহর ছেড়ে। অতনুর খুব মনে পড়ে সেই মার্চের দুপুরের কথা। তিন কোণা পার্কটিতে একটি কদম গাছের ছায়ায় বসেছিল দুজন। অতনু বলেছিল, অপরেশ স্যারের কথা।

সুশান্ত বলেছিল, স্যারকে বললাম আপনি সরে যান, স্যার কাঁদছিলেন।

অতনু বলেছিল, ল্যাবরেটরিটা স্যার নিজে গুছিয়ে নিয়েছিলেন, স্যার তো কেমিস্ট্রি ছাড়া আর কিছু জানেন না, রাত আটটা অবধি ল্যাবরেটরিতে পড়ে থাকেন।

সুশান্ত বলেছিল, সেদিন অত রাতে গিয়ে দেখি স্যার বসে আছেন, তিনি যেন আমাদের জন্যই বসে ছিলেন, আমরা স্যারকে বেরিয়ে যেতে বলি, গুরুদাস কলেজের নবনীত স্যারের পিঠে পিস্তল ঠেকিয়েছিল, আমাদের কিছু করার ছিল না, তুই বিপ্লবের গান পড়েছিস অতনু?

না, পড়িনি, পড়ব। অতনু বলেছিল।

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির ইস্পাত পড়েছিস? জিজ্ঞেস করেছিল সুশান্ত।

না, পড়িনি পড়ব। অতনু স্তিমিত গলায় জবাব দিয়েছিল।

তাহলে তুই কী পড়েছিস, এসব না পড়লে লিখবি কীভাবে ?

চেখব পড়েছি, গোরকির আমার ছেলেবেলা, চেলকাশ আর পথের পাঁচালী, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, পদ্মা নদীর মাঝি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ সেনের গল্প।

সুশান্ত বলেছিল, বিপ্লবের গান আর ইস্পাত পড়, দেখবি তোর লেখাই বদলে যাবে, তুই আর ঘরে থাকবি না, কৃষকের ঘরে গিয়ে তাদের দুঃখের কথা শুনে তাদের কথা লিখতে পারবি।

অতনু বলেছিল, আমাকে চাকরি করতে হবে, বাবা তিন বছর বাদে রিটায়ার করবেন, আমার লেখা হবে না সুশান্ত, আমি ভয় পাই, আমার ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব।

সুশান্ত চুপ করে শুনেছিল অতনুর কথা। হ্যাঁ, 'সংক্রান্তি' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবে। উপায় ছিল না। অতনু চালাবে কী করে? খরচ আছে তো। সে নব্বই টাকার টিউশনি করত। সেই টাকা থেকে কলেজের মাইনে দিত। বাবার কাঁধে ভার ছিল অনেক। নব্বই টাকাই তার সব।

সুশান্ত বলল, মুক্তি নিয়ে সে ফিরে আসবে, অতনুর হাত ধরে বলেছিল, এই শহর নিয়ে কতটা কী লিখবি তুই অতনু, বস্তাপচা প্রেমের নভেল, সারাদেশ জুড়ে কৃষকের মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছে, লেখা হবে তাই নিয়ে, তুই চ আমার সঙ্গে, আর একটা বিপ্লবের গান লিখতে হবে তোকে কমরেড, কমরেড লেনিনের ডাকে জাগে মুক্তি সেনানি।

অতনু চুপ করে ছিল। তার হাত নিজের শক্ত হাতে চেপে ধরেছিল সুশান্ত। অতনুর ভয় করছিল। বইয়ে বিপ্লবের গান পড়া, নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির ইস্পাত পড়া আর ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রয়োগ এক রকম নয়। বই পড়ার মতো সহজ নয়। যতই তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্রের অবসানের কথা লিখুন, তার জন্য বিপ্লবীদের কাছে নিন্দিত হন, তাঁর মতো চেনে না কেউ নিম্নবর্গের মানুষ। পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে যে ভাড়াটে ফ্ল্যাটে উঠেছিল তার বাবা, সেই অপরিসর অন্ধকার ফ্ল্যাট ছেড়ে এক পাও এগোতে পারেননি তিনি। বেঁচে থাকা, সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখা কত কষ্টের। অতনুর ভালোবাসা আছে বিপ্লবীদের প্রতি, কিন্তু সুশান্তর সহযাত্রী হতে পারবে না সে। সুশান্তর সব কথা সে সমর্থন করতে পারে না। অতনু বের হয়নি ঘর ছেড়ে। অতনু সুশান্তকে আবার বলেছিল, তার সাহস নেই, সে পারবে না। হ্যাঁ, সে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। স্বার্থপর। যদি সুশান্ত বলে সে প্রতিবিপ্লবী, তবে তাইই। সে পারবে না। বাবা মা তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

সাহস ছিল না অতনুর। কলকাতায় রয়ে গেল। পত্রিকা বন্ধ হলো। সে লিখতে চেষ্টা করেছিল এখানে ওখানে। কিন্তু তেমন সাড়া পায়নি। লেখার জন্য ও ত্যাগ করতে হয়। সেই প্যাশন তার ছিল না। চাকরিতে জুতে গেল। জেলায় পোস্টিং। কলকাতা ছেড়ে এই প্রথম বের হওয়া। সুশান্তর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কলেজের বন্ধুরা কলেজ জীবন শেষ হওয়ার পর ধীরে ধীরে সরে যায়। জীবন তাদের নিয়ে যায় নানা ক্ষেত্রে। কেউ খুব বড় হয়, কেউ কিছুই করতে পারে না শেষ অবধি। অতনুদের ইস্কুলের বন্ধু এই বেলগাছিয়া বাজারে সব্জি বেচে। এক বন্ধু ট্রামের কন্ডাক্টর ছিল। আগে বেলগাছিয়া ধর্মতলা রুটে তাকে দেখা যেত। এখন নিশ্চয় রিটায়ার করে গেছে কিংবা অন্য রুটে আছে। এক বন্ধু আই এ এস। এক বন্ধু কাটা কাপড়ের বিজনেস করে। একজনের চায়ের দোকান। তার দোকানের পাশ কাটিয়ে আসার উপায় নেই। হাত ধরে টেনে কুশল জিজ্ঞাসা করবেই। চা-ও খাওয়াবে। কিন্তু সুশান্তর কোনো খোঁজ ছিল না। ইস্কুলের বন্ধু জয়দেব বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে বেরিয়েছিল ঘর ছেড়ে। জেল খেটে মুক্ত হয়ে বড় চাকরিতে ঢুকেছিল। তার সঙ্গে অতনুর দেখা হয়েছিল আচমকা এক কাফেতে। সে অনেকের খোঁজ নিয়েছিল। যেন অতনু সব জানে। অতনু সাধারণ সরকারি চাকরি করে উপরে উঠেছে প্রোমোশনে প্রোমোশনে। বিপ্লব করতে যায়নি, জেল খাটেনি, খুব বড় চাকরি করেনি, শুধু সন্তান মানুষ করেছে। তার পক্ষে খোঁজ রাখা সম্ভব ছিল বন্ধুরা কে কোথায় কী করছে। জয়দেবকে সুশান্তর কথা জিজ্ঞেস করেছিল অতনু। জয়দেব বলেছিল, চেনে না।

একই পার্টি, চেন না কেন জয়দেব ?

জয়দেব বলেছিল, কত ছেলে কতদিকে কাজ করতে গিয়েছিল, সে ছিল বীরভূম, সুশান্ত যদি বীরভূমে যেত হয়তো চেনা হতো।

জয়দেব পড়ত বিদ্যাসাগর কলেজে। সুশান্তকে তাই চিনতই না সহপাঠী হিশেবে। অতনুর ইস্কুলের বন্ধু জয়দেব, কলেজের বন্ধু সুশান্ত এবং অফিস কলিগ মনোরঞ্জন। মনোরঞ্জন সমস্ত জীবন তত্ব বিচার করেই কাটিয়ে গেল। বিপ্লব কেন হয়নি, তা তত্ব সহযোগে বুঝিয়ে দেবে মনোরঞ্জন মজুমদার। সে বিপ্লবের ঝুলি বয়েই নিশ্চিন্ত জীবন কাটিয়েছে। বাড়ি করেছে, সংসার করেছে। সতর্ক হয়ে অনেক বিপ্লবীয়ানা দেখিয়েছে। অনেকের খোঁজ পেয়েছিল অতনু। শুধু সুশান্তর পায়নি। ভেবেছিল বেঁচে

নেই সুশান্ত। ভাবতেই পারেনি “সংক্রান্তি” পত্রিকা আবার বের হচ্ছে। তার ভিতরে গ্রামের কথাই থাকে। চাষির কথা, জেলের কথা, ক্ষেত মজুরের কথা লেখা হয়। যাদের নিয়ে বিপ্লব করতে গিয়েছিল তাদের দুঃখের কথা নিয়েই “ সংক্রান্তি”। একটা সময় থেকে আর একটা সময়ে যাওয়ার সন্ধিক্ষণ।

হারিয়ে যাওয়া সুশান্তর দেখা পেল সে শিয়ালদা স্টেশনে, কাঁধে আধ ময়লা ঝোলা ব্যাগ, মাথার চুল অনেকটা ঝরে গেছে, দীর্ঘকায় সুশান্ত যাবে বেলঘরিয়া। আসছে প্রেস থেকে। প্রেস বউবাজারে। অতনুকে সে-ই চিনেছিল, অতনু, আমি সুশান্ত, অতনু ভুলে গেলি আমাকে ?

অতনু অবাক হয়ে সুশান্তর দিকে তাকিয়ে ছিল। চেনা যায় কি? সেই সময় আর এই সময় কি এক ?

তিন

আয় ভাইডি হাটে যাই
ওই লিচুড়া কিনে খাই
ওই লিচুড়া পোকড়া
মা-ঝি ঝোকড়া।

লতা, বহ্নিলতার বয়স বছর দশ। সস্তার ফুল ছাপ নতুন ফ্রক পরা। কোমরের ফিতে দাঁতে কাটা তার অভ্যেস। পায়ে নতুন হাওয়াই। বিশ্বনাথ কিনে দিয়েছে হয়তো। এপ্রিলের কলকাতায় নগ্ন পায়ে হাঁটা কঠিন। তাদের দ্বীপে কত বাড়িতে সবদিন ভাত হয় না। নোনা জল নোনা মাটি। ধান হয় একবার। আবার বান হলে সেই ধানক্ষেতে নোনা জল ঢুকে সব শেষ করে দিয়ে যায়। তাই হয়েছে মা। তোমাদের কলকাতায় তো বাঁধ নেই যে ভাঙবে, জমি নেই যে ভাসাবে নোনা জলে, ঝড়-বিষ্টি হয় না।

হয় ঝড়-জল। কিন্তু কলকাতায় কতটা কী হতে পারে? দু-একটা গাছ পড়ে, ডাল ভাঙে। একবার গাছের ডাল ভেঙে পড়েছিল একটি নীল মারুতি গাড়ির উপর। তা নিয়ে কত খবর। টিভিতে দেখা গিয়েছিল তা। কেন কর্পোরেশন সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটিকে উদ্ধার করেনি। মাঝে মধ্যে ঝড়ে কিছু হয় বটে, তেমন কিছু হয় না। হ্যাঁ, বর্ষায় জীর্ণ বাড়ি ভেঙে পড়ে মারা যায় কিছু নিরুপায় মানুষ। তা একদিনের খবর। পরের দিনে ভুলে যাওয়া। একবার কালবৈশাখী ঝড় এসেছিল দুপুরে। সে বাড়ি ফিরেছিল অনেক রাতে। মেইন লাইনে ট্রেনের তার ছিড়েছিল। বাস ছিল কম। তবু ফিরতে পেরেছিল অনেক কষ্ট করে। কলকাতায় তো আবাদী জমি নেই যে বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে কয়েক বছরের মতো নষ্ট করে দেবে জীবন জীবিকা। সুন্দরবনের ঝড়-বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় কত জনকে। তাদের কেউ ফিরতে পারে, কেউ পারে না। ভাদ্রমাসের ষাঁড়া-ষাঁড়ি বানের কথা বলে সুন্দরবনের বলাইহরি। ভাদ্রমাস অভাবের মাস। সারা বছরের অভাব ডেকে আনেও সেই ভাদ্র মাসের বান, ঝড়-বাদল। মেয়ে ক্লাস ফোরে উঠেছিল। ঝড়ে তাদের ইস্কুল উড়ে গেছে। মিড-ডে-মিল, উহু ইস্কুলে তো খেতে দিত না। তবে দেবে তা শোনা যাচ্ছে অনেক দিন। সরকারের তো আঠের মাসে বছর। ঝড়ে চাল উড়ে গিয়ে ইস্কুল নেই, মাস্টার আছে ভুজঙ্গ স্যার। তিনি পঞ্চায়েতে গিয়ে বসে থাকেন বলেছিল বলাই। ইস্কুল নেই, কিন্তু মাস্টারের বেতন আছে। সেদিন হাসনাবাদের বিশ্বনাথ গায়েন এবং মথুরগঞ্জের বলাইহরি মৃধা সকলে ছিল বেলঘরিয়ায়। কত রাত অবধি কথা হয়েছিল। মেয়েটা ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বলাইহরি বলছিল, মা, দিয়ে গেলাম, আমার আর একটা আছে, ছেলে, এইটিই বড়, পড়ায় মাথা ছেল, কিন্তু সব ইচ্ছে তো পূরণ হয় না, পেটপুরে খেতেই পায় না, তো পড়া, শিখায়ে পড়ায়ে নেবেন মা, আমি আর কী বলব।

বিশ্বনাথ গায়েন হাসনাবাদের একটি ইস্কুলে পড়ায়। বিপ্লবী আন্দোলনে ছিল। এখনো যোগাযোগ রাখে সুন্দরবনের মানুষের সঙ্গে। ঝড়-বাদল হলে সে অনেকবার গেছে রিলিফ নিয়ে। পঞ্চায়েতের সঙ্গে তা নিয়ে গোলমাল হয়েছে। পঞ্চায়েত চায় সবটা নিজের হাতে থাকুক। বাইরের কাউকে ঢুকতে দেবে না ত্রাণের কাজে। সরকারি দল এমন ভাবে সব কিছু নিজের কাছে রাখতে চায় যে ইচ্ছে থাকলেও কিছু করা যাবে না। বাইরে থেকে যে ত্রাণ সামগ্রী আসছে, সবই পঞ্চায়েতে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতই তা বিলি করছে। তাতে কেউ পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না। আগে পার্টির খাস লোক তারপর অন্যরা। এমনি তো হচ্ছেই অনেকদিন ধরে। এইটাই রীতি। সবাই তাই পার্টির পতাকা কাঁধে নেয়। যে নেয় না, তার কপাল খারাপ।

বলাইহরি বলে, বান উঠলে জমির যা দশা হয়, জমি ঠিক করতি পরের বছরের বর্ষার জলের জন্যি বসি থাকতি হয়। গাঙ উঠে আসে জমিনে, নুন আর পলিতে ভর্তি হয়ে যায়, উদিকে সব অমন হয়, রিলিফ ছাড়া বাঁচার উপায় নাই।

যে কথা বহু রাত অবধি হতে থাকে, সে কথা অনেক বছর আগে তাদের যৌবন কালে শুনত তারা গাঙ পানির নোনা দেশ আর বন-পাহাড়ে বিপ্লব করতে গিয়ে। বদলায়নি কিছুই। অভাব, অন্নহীন জীবন সবই রয়ে গেছে। পৃথিবীর গা থেকে মুছবে না বোধ হয় কোনো দিন। হ্যাঁ, আছেই তো, ক'বছর আগে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি থেকে অনেক ভিতরে আদিবাসীগ্রামে না খেয়ে মরছিল মানুষ। খবর হলে সেই একই কথা, না খেয়ে মরেনি, অসুখে মরেছে। অসুখ যে অপুষ্টি আর না খাওয়া থেকে হয়েছে তা কে বলবে? কিছু মানুষ জন্মায় অনন্ত দুর্ভিক্ষ নিয়ে। এ তাদের ভবিতব্য। খন্ডন হবে কবে তা কেউ জানে না। তারা যেন এক আলাদা ভারতের মানুষ। মূল ভারত তাদের নিয়ে ভাবতে চায় না।

মেয়েটা মেঝের উপর লুটিয়ে আছে। মাথার উপর বনবন করে পাখা ঘুরছে। অপুষ্টিতে ভরা হাড় -পাঁজরা বের করা শরীর। বহুদিন বাদে পেটপুরে খেয়েছে। সারাদিনের পরিশ্রমের ধকলে কুঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক রাত অবধি তারা শুনল কত রকম সব কথা। কতদিন বাদে শুনল। এখন তো কলেজ স্ট্রিট, প্রেস আর বাড়ি। মাঝে মধ্যে পুরোনদের কাউকে কাউকে দেখতে পায়। দেখা হয়ে যায়। অনেকেই সরকারের ছায়ায় সুখে আছে। অনেকেই নানা ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। উপন্যাস লিখেছে, আত্মজীবনী লিখেছে সেই লাল টুকটুকে দিনের। জেলখানার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছে। আবার সব ভুলে গিয়ে সংসার করছে দারুণ। কর্পোরেটের দাসত্ব করছে। সরকারী আমলা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করছে। ঘুষও নিচ্ছে। আবার সৎ হয়েও বাঁচতে চাইছে। এর মানে ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে গেছে। জগতের চলন-বলনের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শুধু তারা কিছুই করতে পারেনি নিজেদের পরাজিত মনে করা ছাড়া। পরদিন ভোরে বিশ্বনাথ আর বলাই চলে যায়। মেয়েটি তখনো ঘুমোচ্ছে। ডাকতে গিয়েছিল বহ্নিশিখা, কিন্তু বারণ করেছিল বলাই, থাক মা, ও কোনোদিন আমাদের কাছ ছাড়া হয়নি, এখন কান্নাকাটি আরম্ভ করবে, আমিও দোটানায় পড়ব, থাক ঘুমোক, পেটপুরে তো খেতে পাবে।

অনেক বেলায় উঠেছিল সে। বাবা আর বিশ্বনাথ কাকাকে না দেখে কেমন হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। এত সময়ে যেন বুঝেছিল সমস্তটা। বুঝতে পেরেছিল বাবা আর হাসনাবাদের কাকা তাকে রেখে গেছে। সে চুপ করে বসেছিল। বহ্নিশিখা দেখছিল তাকে একটু তফাত থেকে। সে অনেকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করল, বাবা চলি গেছে ?

হ্যাঁ, ভোরে না গেলে বেলা থাকতে পৌঁছতে পারবে না। বলেছিল বহ্নিশিখা।

বাড়ি চলি গেছে? মেয়ে আবার জিজ্ঞেস করে।

তাই তো বলল। বহ্নিশিখা বলেছিল।

সে নিঃশব্দে চোখ মুছতে আরম্ভ করেছিল, তারপর বলেছিল, আমার মন কেমন করতেছে গো মা, বাবা আমারে ফেলে চলি গেল!

আসবে আবার, এবার থেকে তুই আমাদের কাছে থাকবি। বহ্নিশিখা এগিয়ে এসে তার রুক্ষ চুলের জটে হাত দিয়েছিল, ইস কী হয়েছে, বটের ঝুরি, চুলে তেল শ্যাম্পু পড়েনি কতদিন।

সে যেন সুন্দরবনের বাঘিনীর সন্তান, গ্রীবা ঘুরিয়ে বলল, আমি বাড়ি যাব।

যাবি যাবি, এখন আমার কাছে থাক। বহ্নিশিখা তার পিঠে হাত রাখে।

না গো, আমি মথুরগঞ্জ ফিরে যাব। বলে সে চোখ মুছতে থাকে।

আচ্ছা যাবি, তোর বাবা আসুক। সুশান্ত বলেছিল।

সে গোঁজ হয়ে বসে রইল। বহ্নিশিখা কী করবে বুঝতে পারে না। এই মেয়ে যদি সত্যি বাড়ির জন্য গোঁ ধরে সে করবে কী? হাসনাবাদে গিয়ে বিশ্বনাথ গায়েনের কাছে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু বিশ্বনাথ যে বলেছিল ওর বাবার উপায় নেই তাই মেয়েকে নিয়ে আসছে কলকাতায়। খেয়ে বাঁচবে তো। মেয়ে চুপ করে বসে থাকে অনেক সময়, তারপর নিজে নিজেই বলল, সে অনেক দূর গো মা, গাঙের পর গাঙ পারিয়ে যেতি হয়, হাসনাবাদের কাকা ছাড়া কেডা চেনবে?

কথা হচ্ছিল বহ্নিশিখা আর মেয়েতে। সুশান্ত দূরে বসেছিল। সে দূর থেকেই বলল, আমাদের পছন্দ হচ্ছে না তোর, আমরা কি খারাপ লোক?

সে লজ্জিত হয় যেন। মুখ নিচু করে মাথা নাড়ে, বলে, আমার যে ভাইয়ের জন্যি মন কেমন করতেছে গো, আমি কী করব বলো, ভাইডারে আমি ঘুম পাড়াই শোলোক বলে।

আহা! বুক ভরে গিয়েছিল বহ্নিশিখার। শ্লোক বলা কাজলাদিদি। কেমন ছলছলে চোখে তাকিয়ে আছে। বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ যেন না ওঠে আজ।

সুশান্ত বলে, ভাই ভাল থাকবে, এরপর যখন যাবি, নিয়ে আসবি ভাইকে।

মাথা নাড়ে মেয়ে, বলে, হবেনি গো, ছুটো খুব, সে মা ছাড়া থাকতি পারবেনি, মার কাছে ঘুমায়, মা তারে ঘুম পাড়ায়, মা ছাড়া থাকবেনি,

ঘোম আয় ঘোম আয় ঘোম গাছের পাতা
রাজবাড়িতে আয় ঘোম হস্তি ঘোড়ার মাথা
গিরস্তবাড়িতে আয় ঘোম শেলের পহর ডাক,
আমার মনির চোখে ঘোম নাই গো
ঘোম দিয়ে দিয়ে যাক।

মা তুমি শোলোক জানো? মেয়ে জিজ্ঞেস করে।
বহ্নিশিখা বলে, নারে আমি জানি না, তুই আমারে শিখিয়ে দিস।
আমি আর কত জানি, সব জানে আমার মা আর ঠাকমা, আগে ভাই মা ঠাকমা ছাড়া ঘুমাত না, আমিও ঘুমাতাম ঠাকমার শোলোক শুনতে শুনতে, এখন আমিও শোলোক বলি।
কী শ্লোক ? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।
মেয়ে গুনগুন করে,

হলদি গাছের গোড়ারে
লাল পাখিডা ডায়েরে
অত ডাহা ডাহিস না
শ্যামের গলা ভাঙিসনে।
পিচিং ফিচিং কাঁদিসনে।

সুশান্ত বলে, তুই তো মা ছাড়া থাকতে পারবি তো ?
হাঁ, পারব, আমি তো বড় হই গিছি। মেয়ে বলল।
সুশান্ত আর সেই লতার কথার ভিতরে বহ্নিশিখা শুধু তার গায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল। হাড়জিরে মেয়ে, তবু কত নরম। ফুলের গায়ে হাতের আঙুল ছুঁইয়ে দিচ্ছিল যেন বহ্নিশিখা। সে এতটা জীবন কখনো এমনি নিজের মতো করে হাত ছোঁয়াতে পারেনি এমন কারো গায়ে। আহা কী সুখ! সুশান্ত তখন সেই বালিকাকে বশ করে ফেলেছে প্রায়, বলছে, তুই মোটেই বড় হসনি তা আমি বুঝে গেছি, বুঝলি।
কী করে বুঝলে ? মেয়ে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছে।
বড় হলে কি মন কেমন করছে বলতিস খুকি ? সুশান্ত বলেছে।
লতা বলেছিল, খুকি না, আমার একটা নাম লতা, আর একটা নাম কবিতা, আমার দাদু নিতাইহরি মিধা দেছে কবিতা, মা বাপে দেছে লতা, কিন্তু আমার যে ভাইয়ের জন্যি মন কেমন করতেছে গো।

একখান নৌকা
দুইখান নৌকা
তিনখান নৌকা
নৌকা সারি সারি
তারপরে উঠে দেখি
লালবিবির বাড়ি।

ও ভাই আমরা লালবিবির বাড়ি যাব, ঘুমা……, ভাইরে ঘুম পাড়াই আমি। বলতে থাকে মেয়ে।
আচ্ছা, ভাইকে নিয়ে আসতে বলব তোর বাবাকে। বলেছিল সুশান্ত।
ভাই আসপে না, মারে ছাড়া থাকতি পারে না। সে বলেছিল।
আচ্ছা তোর মাকে নিয়ে আসব তাহলে। সুশান্ত বলেছিল।
সে বলেছিল, মা আসপে না, ঠাকমা দাদুরে কে দ্যাখপে?

সুশান্ত বলেছিল, তাদের যদি নিয়ে আসি।

হবে না, গাঙ-পানির দেশ ছাড়া তারা থাকতি পারবেই না, গেরাম থেকে কুথাও যাবে না, শুধু বলে বিরামপুরার কঠিন দেশে যেতি পারত যদি আর একবার! বিজ্ঞের মতো বলেছিল সেই মেয়ে।

তাহলে তুই একা থাক, আমাদের কাছে থাক।

লতা গুনগুন করল,

চাল কুটতে গিছিলাম
একটা ডিম পেয়েছিলাম।
সেই ডিমডা কই?
কাকে খেইছে।
সেই কাকটা কই?
ডালে বসেছে।
সেই ডালডা কই?

আমার ঠাম্মা সারাদিন এমনি বলে,তার মতোন কেউ জানে না। বলতে বলতে সে বহ্নিশিখার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, হ্যাঁ গো মা, তুমি আমাদ্দের গাঁয় যাবা ?

যাব, যাব। বহ্নিশিখা বলে।

গাঙ দেখলি ভয় পাবা না? চোখের সামনে তর্জনী তুলে বলল সে।

না, পাব না, আর তুই থাকলে ভয় কী? বলে বহ্নিশিখা তার গাল টিপে দিল। বড্ড মায়া জন্মে যাচ্ছে যে। এমন কথা ইহজীবনে শোনেনি সে। মেয়ে বলছে, গাঙ গেল, গাঙের বাঘিনী দেখলি বুক কাঁপবে না ?

চার

বহ্নিশিখা সেদিন ইস্কুলে গেল না। লতাকে বলল, তোকে আমি সাবান শ্যাম্পু দিচ্ছি, পেস্ট ব্রাশ দিচ্ছি, দাঁত ব্রাশ করে ভাল করে স্নান করে নে, তারপর খাবি।

ও মা, এখনই আমি খাব, বেলা হইনি, কাজটাজ করি আগে।

কাজ করতে হবে না আজ, কাচা জামা আছে?

তার কোলের কাছেই পুটুলিটা ছিল। তা খুলল বহ্নি। রঙিন শালোয়ার কামিজ। টপ আর লং স্কারট। দামী খুব। এগুলো পুটুলির ভিতরে রেখে সে কেন ওই ফ্রক পরে এসেছে ? কারণ ওটা যে নতুন। হাসনাবাদের কাকা কিনে দেছে। লং স্কারট আর দামী শালোয়ার কামিজ কোন একটা ঝড়ের পর রিলিফে পাওয়া। পঞ্চায়েতে এসেছিল, পঞ্চায়েত দেছে। পরা হয় না। অনেক বড়। ঢোলা হয়। লতা বলল, ওর ভিতরে আমরা সবাই ঢুকে যাব গো, আমি, মা, ভাই, বাবা, কী করে পরব?

বহ্নি দেখল তুলে। সত্যি খুব বড়। ব্যবহার করা শালোয়ার কামিজ। যার ছিল সে অতি পৃথুলা, ক্ষীর ননী খাওয়া মেদবহুল কেউ। দান করে দিয়েছিল বান-বন্যায় সর্বস্বান্ত মানুষের জন্য, সেইটা গিয়ে পৌঁছেছে এদের কাছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে সুন্দরবনের মেয়ে, যদি দর্জিকে দিয়ে কাটিয়ে নেওয়া যায়। সুশান্তকে তখন বহ্নি পাঠাল, যাও তো, মার্কেট খুলেছে কি না দেখ, স্মল সাইজ বলবে, ফ্রক আর শালোয়ার কুর্তি নিয়ে এস দুটো করে, স্নান করে পরবে কি, আমার শাড়ি?

লতা বলল, হাঁ পরব মা, তুমার ম্যাক্সি নেই, মারডা তো আমি পড়ি।

কীভাবে ব্রাশ করতে হয় সে জানে। হাসনাবাদের গায়েন কাকার বাড়িতে দেখেছে। তারা তো ঘুটের ছাই দিয়ে দাঁত মাজে। বাবা নুন দিয়ে মাজে। মা মুখে দেয় তামাক পোড়া। ব্রাশ করে চোখমুখ ধুয়ে আসতে বহ্নি তাকে বিস্কুট দেয়। আর বিস্কুট দেখে সে কেঁদে ফেলে, বলে, ভাই বায়না করে, বাবা দেয় না।

মা বাবা ভাই বোন এক সঙ্গে ছিল। একজন আলাদা হয়ে কলকাতা চলে এসেছে। বহ্নিশিখা সুশান্তকে বলে, একে দিয়ে কাজ করাবে কী করে?

সুশান্ত চুপ করে থাকে। বহ্নি বলে, শিশু শ্রমিক তো আইন বিরুদ্ধ।

সে তো আমরা জানতামই, গায়েন বলেছিল বচ্ছর দশ। সুশান্ত মৃদু গলায় বলে।

বহ্নিশিখা বলেছিল, তাহলে একে নিয়ে আমরা করব কী?

সুশান্ত বলেছিল, ফিরিয়ে দেবে ?
আর এক জায়গায় দিয়ে দেবে ওর বাবা, খাওয়ানোর ক্ষমতা নেই। বহ্নি বলেছিল।
সুশান্ত বলেছিল, আমরা তাহলে করব কী ?
বহ্নি বলেছিল,

ট্যাংরা মাছের ট্যানট্যানানি
পাঙাস মাছের ধাড়ি
কুন পতে যাব আমি
রাঙাদিদির বাড়ি?

কত জানে গো মেয়েটা, মুখে যেন খই ফুটছে, সব নাকি ওর মা ঠাকুমা বলে।
সুশান্ত বলে, তুমি অযোদ্ধ্যা পাহাড়ে শোনোনি?
ঝুমুরগান, ভাদুর শ্লোক। বিড়বিড় করে বহ্নি, সব ভুলে গেছি গো।
বহ্নিশিখা আর সুশান্তর ঘুম ছিল না। মেয়েটাকে নিয়ে সারাদিন কেটেছে বহ্নির। এখন সে ঘুমোচ্ছে। তার জন্য একটা ঘরই গুছিয়ে দিয়েছে সে। গাঙের ধারের এই মেয়ে এসে ঝড় তুলেছে তাদের দুজনের ভিতর। কত বছর বাদে যৌবনবেলার উষ্ণতা ফিরে এসেছে যেন। বহ্নি সুশান্তর গলা জড়িয়ে বলল, ও আমাকে মা ডাকছে গো, ও সেই অযোদ্ধ্যা পাহাড়, জয়চন্ডী পাহাড় থেকে মা ডাকতে ডাকতে এ বাড়ি এসে উঠেছে।
সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, কী বলতে চাও, বলো, বলো।
বহ্নিশিখা বলল, আমাদের হোক না ও, আমাদের তো কেউ নেই।
সুশান্ত বলল, ওর মা বাবা ভাববে শহরের বাবু কেড়ে নিল, আমরা বলতাম না শহর কেড়ে নেয়, গ্রাম শুষে নিয়ে শহর নিজেকে সাজায়, তুমি বাড়ি সাজাবে, সংসার সাজাবে ওকে দিয়ে ?
তা কেন হবে, কেড়ে নেব কেন, ওর মা বাবাকে বলেই নেব। বহ্নিশিখা বলেছিল।
যদি না দেয়? সুশান্ত কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল।
বহ্নিশিখা বলল, নেব মানে সত্যিই তো নেব না, আমাকে ও মা বলছে, আমি মা হয়ে থাকি।
সুশান্ত বহ্নি সেদিন কতরাত অবধি জেগেছিল। শেষে সুশান্ত বলল, তোমাকে মা বলছে বলুক, আমাকে পিসে কিংবা মেসো বলুক, জেঠা বলতে পারে, আমি বাবা হয়ে গেলে ওরা ভাববে আমরা সত্যিই কেড়ে নিলাম। কেড়ে নেব না বহ্নি। হাত পাতব যদি দেয় ওই বলাইহরি আর ওর বউ, লতার মা।
তাইই হয়েছিল। সুশান্ত চলে গিয়েছিল হাসনাবাদ। সেখান থেকে বিশ্বনাথ গায়েনকে নিয়ে গাঙ পার হয়ে পার-হাসনাবাদ থেকে ট্রেকারে চেপে ভাঙাচোরা রাস্তায় দুলতে দুলতে গৌড়েশ্বর নদীঘাট অবধি। সেই নদী খেয়ায় পার হয়ে আবার ট্রেকার। চলছে তো চলছে, দু ধারে মেছো ভেড়ি, ধানকাটা মাঠ, বহুদূর বিস্তৃত গ্রাম ছায়া। বাতাসে জলের গন্ধ। বোঝা যায় ওই ভূখন্ড ঘিরে আছে গাঙের পর গাঙ, জল আর জল। ট্রেকার এসে থামল তিন নদীর মোহনায়। রায়মঙ্গল, কালিন্দী আর গৌড়েশ্বর। কালিন্দী আর রায়মঙ্গল সমুদ্রের মতো প্রায়। গৌড়েশ্বরের পুব কোণে বাংলাদেশ দেখা যায়। রায়মঙ্গল ধরেই তারা যাবে। সেই নদী দেখে ভয় করে। একুল ওকুল, দুকুলই তার নেই। বিশ্বনাথ গায়েন জিজ্ঞেস করল, এদিকে তুমি আস নাই দাদা ?
না, আমার ছিল সন্দেশখালি, ন্যাজাট অঞ্চল, তারপর খোঁচড় পিছনে লাগায় পুরুলিয়া। বিড়বিড় করে বলল সুশান্ত, হঠাৎ হাত ধরে ফেলল গায়েনের, আমরা মরে ছিলাম বিশ্বনাথ, জীবনের কোনো মানে ছিল না হে, একেবারে বদ্ধ জলা, পানাপুকুরের মতো হয়ে গিয়েছিল, তুমি আমারে জীবন দিলে বিশ্বনাথ, নিয়ে এলে এখেনে, মনে হচ্ছে কিছু করার আছে, জীবন এত ফেলনা নয়।
সেই নদীঘাটের নাম লেবুখালি। লেবুখালি থেকে ভুটভুটি নৌকোয় চেপে তারা চলল মথুরগঞ্জের দিকে। মথুরগঞ্জ নয় যাচ্ছে দুলদুলি ঘাটে। দুলদুলি থেকে ভ্যান রিকশায় মথুরগঞ্জ। পৌঁছতে বেলা দুপুর। গাঙ পার হতে হতে সুশান্ত ভাবছিল, কতদূর আর কতদূর, এ এক সভ্যতা বিবর্জিত পৃথিবী যেন। মানুষ কতদূর কোথায় থাকে তা আন্দাজ করাও যায় না নগরে থেকে। মনে পড়ে সেই পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বন পাহাড়ের কথা। দশ বিশ কি তারও কম ঘর নিয়ে একটি গ্রাম। সারাদিন সেই গ্রামে অশক্ত বুড়ি আর বুড়োরা পথের দিকে চেয়ে বসে থাকে দাওয়ার খুঁটো ধরে। কারো দুদিন ভাত পড়েনি পেটে, অপেক্ষা করছে ভাত নিয়ে আসবে ছেলের বউ কিংবা সোমত্ত মেয়ে। চাল-আটা নিয়ে ফিরে ভাত চাপাবে কিংবা

আটা গুলবে বসে। পুরুষরা কাজে গেছে চান্ডিল কি টাটানগরের দিকে, কবে ফিরবে ঠিক নেই। আবার যারা আছে, তারা সন্ধে হলে ঘরে ফেরে, ভোর হলে বেরিয়ে পড়ে কাজের খোঁজে। দিনমানে থাকতে ভরসা কম। পুলিশ খোঁজ করে। কে এসেছে, কে এসেছিল গ্রামে খবর দাও।

মথুরগঞ্জ বাজারে এসে ভ্যান থেকে নামতে হয়। বাজারে পার্টি অফিসে পার্টির পতাকা উড়ছে পতপতিয়ে। বিশ্বনাথ বলে, আইলায় বাজারও ডুবে গিছিল, ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি কেউ।

বছর চল্লিশের এক ব্যক্তি পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বনাথের সমুখে দাঁড়িয়ে পড়ে, কী হলো গায়েনবাবু, কী মনে করে, ইনি?

বন্ধু, সুন্দরবন দেখতে এসেছেন, এদিকটা দ্যাখেননি। গায়েন বলল।

আইলায় সব শেষ হই গেছে, কী দেখতি এয়েচেন, রিপোর্টার নাকি ?

বিশ্বনাথ গায়েন বলল, না, রিপোর্টার নয়, এমনি প্রাইভেটে চাকরি করেন।

সেই ব্যক্তি বলল, ইনি কি আপনার মতো, নকু ছিলেন, কোন প্রাইভেট?

বিশ্বনাথ চুপ করে থাকে। তখন সুশান্ত বোঝে জেরা আরম্ভ করেছে লোকটি। মথুরগঞ্জের পার্টি প্রধান। সে বলে উঠল, এস অ্যান্ড বি কোম্পানি, জাপানি ফার্ম।

লোকটি বলল, একটু আসবেন ভিতরে, বহিরাগত ঢুকায় একটু বিধি নিষেধ আছে, আমাদের সব জানতে হবে, সবদিকে একটা গোলমাল পাকিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে, পার্টি তা বলে দেছে, যা ঘটতেছে বুঝতি পারতেছেন তো, গাড়ি কারখানা হবেই, সব বদল হয়ে যাবে, আপনি কী বলেন, কার পক্ষে?

তখন সদ্য নির্বাচন শেষ হয়েছে। ভোটে সরকারের ছিল প্রবল জন সমর্থন। কিন্তু তার ভিতরেও বহুদিন বাদে চারদিক অশান্ত হয়ে উঠছিল। মানুষ পথে নেমেছিল জমি অধিগ্রহণের বিপক্ষে। হুগলী জেলার সিঙ্গুর খবর হচ্ছিল বার বার। মিছিল আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল সরকারের বিরোধিতা করে। এই বিরোধিতা ছিল অকল্পনীয়। চলছিল মিছিল আর সমাবেশ। সুশান্ত বেরিয়েছিল, হেঁটেছিল, ঘরেও ফিরে এসেছিল। তার মনে সন্দেহ ছিল, সেই সব মিছিল শেষ অবধি প্রতিবাদই হয়ে থাকবে, কেন না রাষ্ট্রশক্তি বড় শক্তি, রাষ্ট্র যদি চায় জমি নেবে, নেবেই। কে আটকাবে ? জমি আন্দোলনে যে সরকারের প্রতিষ্ঠা, তাদের বিরুদ্ধে জমিই হয়ে উঠেছিল প্রধান হাতিয়ার। তাদের ঢুকতে হয়েছিল পার্টি অফিসে। মধ্যয়সী যে ব্যক্তি তাদের ডেকে নিয়ে গেল, তার টানটান চেহারা। ধূর্ত চোখমুখ। কিছু সময় এলেবেলে কথা জিজ্ঞেস করে বলেছিল, দুশো টাকা রিলিফ ফান্ডে দিয়ে যান, মেয়েটারে নেচ্ছেন, ভাত দেবেন তো দুবেলা ?

আঁজ্ঞে। সুশান্ত থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

আমাদের সব জানতি হয়, গাঁ থেকে একটা মেয়ে পাচার হই যাবে, জানব না, হয়?

গা ছমছম করে উঠেছিল সুশান্তর। সব জানে সেই পরিতোষ মন্ডল, গাঁয়ের সব খবর রাখাই তার কাজ। গাঁ থেকে একটি মেয়ে শহরে চলে যাবে ভাতের জন্য, সে কথা সে জানবে না তা হয় না। যাওয়ার ক'দিন বাদে জেনেছে, আগে জানলে ভাবত যেতে দেবে কি না। অভাবে গাঁয়ের মেয়ে কলকাতায় কাজ করতে যাচ্ছে, এই খবর ভালো না। গ্রাম ছাড়তে দেবে না পঞ্চায়েত কাউকে। তবে যদি খবর না ছড়ায় আপত্তি নেই। যদি বলাইহরির হাতে দুশো টাকা বেশি দিয়ে আসা যেত, ভালো হতো। কথাটা বলেছিল গায়েন। টাকা দিতেই এসেছিল সুশান্ত। বেতনের টাকা অগ্রিম দিতে এসেছিল। আসলে তা নয়, মেয়েটাকে তাদের করে নিচ্ছে, সেই কৃতজ্ঞতায় কিছু দেবে লতার মা-বাবার হাতে। মেয়েটাকে তারা পড়াবে। বড় করবে। এইটা একটা মিশন। মথুরগঞ্জের মেয়ে জীবন আবার নতুন করে আরম্ভ করতে শেখাচ্ছে তাদের। হ্যাঁ, সময় ছিল অদ্ভুত। তখন যারা পথে নেমেছিল, তারা অনেক বছর আগে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল একবার। পরাজিত হয়ে ঘরে ফিরেছিল। বয়সের অন্ধকার হাঁ-মুখে ঢুকে গিয়েছিল তারা। ঝিমিয়ে ছিল। এতদিন বাদে এমন কিছু হলো যে বেরিয়ে আসতে পারল। গাড়ির কারখানার হাঁ মুখ থেকে তিন ফসলী জমি রক্ষা করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সময়টা যেন ফিরে আরম্ভ করার মতোই ছিল। যুগ সন্ধিক্ষ। সংক্রান্তি। অসফল আর পরাজিত মানুষেরা নতুন করে বেঁচে উঠতে চাইছিল।

ধ্বস্ত কুটীরের সমুখে নিমগাছের তলায় বসে নিতাইহরি জাল বুনছিল। তার ছেলে বলাইহরি গাঙে মাছ মারতে গিয়েছিল। নিতাইয়ের বউ পুষ্পরানি উঠনে চুলো জ্বালিয়ে মাটির হাড়িতে ভাত রাঁধছিল। তাদের দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মেয়েকে ফেরত আনল নাকি গায়েনদাদা?

কুঁকড়ে দাঁড়িয়েছিল সুশান্ত নিজেই। টাকা দিতে এসেছে, সঙ্গে এক প্রার্থনা। প্রার্থনা না নিয়ে এলে হতো না? মেয়েটাকে পড়াবে,এর জন্য বলতে হবে কেন? সে তো মেয়েটাকে দিয়ে পাঁচবাড়িতে ঠিকে কাজ করিয়ে উপার্জনের কথা বলতে

আসেনি? অভিযোগ নিয়ে আসেনি। কিন্তু টাকা নিয়ে এসেছে, তার মানে কি কিনে নিতে এসেছে? একেবারে কিনে নেবে। আর দেবে না। একটা পুরোন বেঞ্চি এনে দিল পুষ্পরানি, বলল, ওরে কি রাখবা না গায়েনদাদা?

না না, তা কেন, তোমাদের মেয়ে খুব ভালো আছে, বলে উঠেছিল সুশান্ত, লতা খুব ভালো আছে।

পাঁচ

মথুরগঞ্জ থেকে তারা হাসনাবাদ ফিরেছিল অনেক রাতে। অন্ধকারের নদী পার হয়েছিল গায়েন আর সুশান্ত। গায়েন চেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলছিল। তার এদিকে যাতায়াত আছে। সুশান্ত নিশ্চুপ অন্ধকারের নদীর দিকে তাকিয়েছিল। সেই যাত্রাটি অনেক সময়ের। চারদিকে স্রোতের শব্দ, বয়েই যাচ্ছে নদী। সুশান্তর আচমকা মনে হয়েছিল, যদি গাঙের পথ ভুল করে মাঝি। কোন অনন্তে চলে যাবে তারা। একটু দুরু দুরু ছিল বুক। বাড়িতে বহ্নি আছে, বহ্নির মেয়ে আছে। সে তো অনির্দেশ্য অন্ধকারে চলে যেতে পারবে না। মনে পড়ে সেই অন্ধকারে দশমাইল হেঁটে চাকুলিয়া রেলস্টেশন। হাঁটছে তো হাঁটছে। হেঁটেই যাচ্ছে। একা পাহাড়িয়া পথ। পথের শেষ নেই। পথে কুপি জ্বলা গ্রাম। সন্ধে হতে সব নিঝুম। আচমকা মনে হয়েছিল, যদি পথ ভুল করে অন্যদিকে চলে যায়! চাকুলিয়ায় অপেক্ষা করবে কমরেড সীতারাম। সীতারাম তাকে নিয়ে যাবে আর এক কমরেডের কাছে। সেই কমরেড তাকে নিয়ে যাবে আর এক গ্রামে। গ্রাম থেকে গ্রাম। সেখানেও অপেক্ষা করে আছে ভুখা মানুষ। এখন এক কমরেড অপেক্ষা করে আছে বেলঘরিয়ার পুরোন বাড়িটিতে। সঙ্গে আর এক নবীন কমরেড। এক যুদ্ধ থেকে আর এক যুদ্ধে এসেছে। কমরেড! আমরা সব ভুলে গিয়েছিলাম। আবার আরম্ভ করো, আবার। সংগ্রাম ফুরোয় না। যুদ্ধের শেষ নেই। পরদিন ভোরের ট্রেনে সে বাড়ি ফিরেছিল লতার টানে। লতা, বহ্নিলতা। বহ্নিশিখা তার নামের প্রথম দু-অক্ষরের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে লতা বহ্নিলতা। লতার মতো জড়িয়ে থাক আমাকে। তোর নাম অগ্নিলতা বহ্নিলতা। সুশান্ত বসু বহ্নিশিখা বসুর কন্যা বহ্নিলতা মৃধা। লতা থাকল, বহ্নি থাকল, সবই থাকল।

মেয়ে বলল, বাবা, আমার বাবার সঙ্গে তুমার দেখা হলনি?

আমি তোর বাবা নই, বাবা সেই মথুরগঞ্জেই থাকে, শুধু তুই আর একটা মা পেয়েছিস। সুশান্ত বলেছিল শেষ বেলায় ফেরার সময় বলাইয়ের দেখা পাওয়ার পর তার মুখখানি মনে করে। বলাই সব শুনে বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, মেয়ে আমাদ্দের থাকল তো দাদাবাবু?

তোমাদের মেয়ে কি আমরা নিতে পারি?

'থাকলি ভালো, পেথম সন্তান, আর সে মেয়ের অন্তরে বড্ড মায়া,' বলাই বলেছিল, 'তুমাদের আপন করে নেবে।'

সুশান্ত বলাইয়ের হাত ধরে ফেলেছিল,মেয়ে তোমাদের থাকল, আমরা কিছুই করতে পারিনি এ জীবনে, আবার একটা সুযোগ এসেছে।

তখন বিশ্বনাথ গায়েন আশ্বস্ত করেছিল বলাইকে, চিন্তা নেই বলাই, মেয়েটা বড় হবে লেখা-পড়া না শিখে,তাই কি হয়, ভয় নেই তোমাদের।

সেই বহ্নিলতাকে নিয়ে যেদিন তারা ঘরের বাইরে গেল, সেদিন শহর উত্তাল। দুদিন আগে যথেচ্ছ লাঠি পেটা করেছে পুলিশ সিঙ্গুরে। প্রতিবাদে মিছিল বেরিয়েছিল শ্যামবাজার থেকে কলেজস্ট্রিট। কলেজস্ট্রিট থেকে মিছিল গিয়েছিল ধর্মতলা। তারা কলেজস্ট্রিটে পৌঁছে দেখেছিল মিছিল আরম্ভ হলো। কলেজ স্কোয়ারের পেট থেকে মানুষ বেরিয়েই আসছে। লতা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। চোখের পলক পড়ে না। শক্ত করে চেপে ধরেছিল বহ্নিশিখার হাত, এত লোক।

হু, মিছিল। সুশান্ত বলেছিল।

আমাদের ওখেনে এত লোক নেই। মন্তব্য করেছিল লতা, এত লোক কোথায় থাকে মা?

বহ্নিশিখা বলেছিল, সবদিকে থাকে, সবদিক থেকে এসেছে, কলকাতায় এখন লোক আসছে সব দিক থেকে, ভয় ভেঙেছে মানুষের।

কিসের ভয় মা? জিজ্ঞেস করেছিল লতা।

ও তোকে বুঝতে হবে না। বহ্নিশিখা তাকে যেন আঁকড়ে ধরেছিল। ভয় হয়েছিল কি ? মথুরগঞ্জের লতা, বহ্নিলতা তার হাত ছাড়িয়ে মিছিলে না ঢুকে পড়ে। মিছিলে মিশে গেলে আর কি খুঁজে পাবে? জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। এখন কিছুই আর হারাতে চায় না সে। মিছিলে কি মথুরগঞ্জ, যোগেশগঞ্জ, বরুনহাট, হাসনাবাদ, বসিরহাট, হুগলী, পুরুলিয়া, বর্ধমান… সব জায়গার মানুষ আসেনি? এসেছে। তারা কি সুন্দরবনের বহ্নিলতাকে চিনে নেবে না। এই সেই মেয়েটা। আমাদের গাঁ থেকে কলকাতায় এসেছে, ও মণি ভালো আছিস, পেটভরে খেতে পাস তো?

…… আয় আয় আমাদের সঙ্গে আয়। মিছিল করে ফিরে যাব আবার পাহাড়তলীতে, গাঙের ধারে, যে যার ঘরে। ঘর থেকে একবার যখন বেরোতে আরম্ভ করেছি, আবার আসব, আবার।

মা, যাবে না? লতা তাকে টানছিল।
কোথায় যাবরে? সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছিল।
ওদের সাথে।
বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করেছিল সুশান্তকে, কী করবে?
সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছিল বহ্নির মেয়েকে, কী করবরে?
মিছিলে যাব না ? লতা জিজ্ঞেস করেছিল।
আজ না, আর একদিন। সুশান্ত বলেছিল, আজ বই।
মেয়ে বলেছিল, বই কিনে দেবে তো ?
বই কিনতেই তো এসেছি। সুশান্ত বলেছিল।

আচ্ছা একটু দেখি মিছিল। মেয়ে মুগ্ধ চোখে দেখছিল মানুষের সারি। পতাকা নেই। শুধু মানুষ। আর প্ল্যাকার্ড। কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে থেকে মিছিল শুরু। মানুষ বেরিয়েই আসছে, বেরিয়েই আসছে। সুশান্তর কী মনে হলো মেয়েটাকে নিয়ে এগিয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। বহ্নি তাদের অনুসরণ করল। লতা অবাক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশচুম্বি বাড়ির দিকে তাকিয়ে। মিছিল হেঁটে যাচ্ছে ট্রাম লাইন মাড়িয়ে। কালো রাস্তা দাপিয়ে । মানুষের গর্জন শোনা যাচ্ছে। মেয়ে মিছিলের এত কাছে এসে বহ্নিকে আঁকড়ে ধরে। আঁকড়েই থাকল। সুশান্ত বলল, হয়েছে, ফেরো, চেনা কেউ দেখতে পেলে টেনে নেবে, আমাদের মেয়েই আমাদের মিছিল, ওর সঙ্গে হাঁটব।

একবার পা মেলাবে না ? জিজ্ঞেস করেছিল বহ্নিশিখা, লতা দেখুক।

সুশান্ত বলেছিল, অনেক হেঁটেছি, আজ বই নিয়ে বাড়ি ফিরব।

বহ্নিশিখা চুপ করে গিয়েছিল। মিছিলে না গিয়ে মেয়ের বই কিনে তাকে নিয়ে ফেরত এসেছিল তারা বাড়ি। সন্ধে সন্ধে। ফিরে এসে দুজনে চুপ হয়ে গিয়েছিল। এমন কি হয়েছে ইদানীং কালে ? জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার প্রতিবাদ রাজপথে নেমে এসেছে। এমন প্রতিবাদ বহুদিন দ্যাখেনি তারা। কিন্তু শুধুই দেখল, দূর থেকে দেখে ফিরে এল। মেয়ে। মেয়ে। মেয়ে। মেয়েটাকে নিয়ে মিছিলে যাবে না। অত মানুষ, ও যদি হারিয়ে যায়। তাইই কি? মেয়ে হারাবে কেন? হাত ধরে হাঁটত না হয়।

বহ্নিশিখা বলল, তুমি যেতে পারতে, আমি মেয়ে নিয়ে ফিরতাম।

সুশান্ত বলল, যা হয়নি, তা আর হবে না, মেয়েটা বড় হোক, কত মিছিলে যাবে।

তখন ফোন এল ল্যান্ড লাইনে, আমি অনিমেষ বলছি সুশান্তদা, আমরা দেখেছি, আপনি শেষ পর্যন্ত ওই মিছিলে পা বাড়াননি, অভিনন্দন।

অনিমেষ সান্যাল শাসক দলের মুখপত্র সংবাদপত্রে চাকরি করে। অনিমেষের সঙ্গে বছর দশের পরিচয় তাদের, সে বলল, আমি আপনার একটা সাক্ষাৎকার নেব?

কেন? সুশান্ত জিজ্ঞেস করে।

জমি নিয়ে যে আন্দোলন তা শিল্পের বিরোধী, আপনি একে সমর্থন করেন না, বলুন কিছু, কেন অসমর্থন। অনিমেষ জিজ্ঞেস করে।

আমি তো বলিনি সমর্থন করি না। সুশান্ত বিরক্ত হয়েছিল।

আপনি তো মিছিলে যাননি। অনিমেষ বলেছিল।

যাইনি মানে কি অসমর্থন? সুশান্ত পাল্টা জিজ্ঞেস করেছিল।

সুশান্তদা, বিষয়টাকে আমি ঐভাবে দেখছি, আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ছিলাম, দায়িত্ব ছিল নজর রাখার, মেয়েটি কে আপনাদের সঙ্গে ছিল?

আমাদের মেয়ে। সুশান্ত বলেছিল।

আপনাদের মেয়ে ছিল বলে জানি না তো।

সুশান্ত তার ধৈর্য হারায়, তুমি কী বলতে চাও খুলে বল দেখি।

অনিমেষ বলে, যাকেই রাখবেন বাড়িতে থানায় একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখবেন, পুলিশ কি মাইকিং করে বলেনি?

সুশান্ত বিরক্ত হলো, তোমার আর কিছু বলার আছে?

অনিমেষ বলল, কাজের মেয়েকে নিয়ে মিছিলে যাবেন ভেবেছিলেন সুশান্তদা, শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলেছেন, ভাল করেছেন, আমি লিখছি আপনি এই হঠকারি মিছিলের পক্ষে নেই, গণ আন্দোলন থেকে উঠে এসেছেন আপনি, জরুরি অবস্থায় জেল খেটেছেন, বামফ্রন্ট আপনাকে মুক্তি দিয়েছিল, আপনার সব মনে আছে নিশ্চয়।

সুশান্ত বলল, আমি এই মিছিলের পক্ষে, আমার মেয়ে হাঁটতে পারবে না অতটা তাই যাইনি, আর বই কেনার ছিল।

আপনার মেয়ে! অনিমেষ অবাক, কী যা তা বলছেন, আপনার মেয়ে কোথা থেকে এল?

হ্যাঁ, আমাদের মেয়ে, আমরা ওকে পালন করছি। সুশান্ত জোর গলায় বলেছিল।

আমি জানি সুশান্তদা, বহ্নিদি বলেছে সব ইস্কুলে, ওই ইস্কুলে আমাদের পার্টির চন্দ্রিমা কাজ করে, সে আমাদের পত্রিকায় লেখে, খবর সে দিয়েছে, মথুরগঞ্জ থেকে এনেছেন? নির্লিপ্ত গলায় কথাটা বলেছিল অনিমেষ।

সুশান্ত বলল, হ্যাঁ।

আমরা মথুরগঞ্জে খোঁজ নিয়েছি সব, ওর মা-বাবার নাম......।

সুশান্ত খুব ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কী বলতে চাও?

আপনারা কি মেয়েটাকে পাকাপাকি নিয়ে এলেন ?

সুশান্ত বলল, তোমার খোঁজ নেওয়ার উদ্দেশ্য ?

অনিমেষ বলল, আপনি ওকে মিছিলে হাঁটাবেন না, ওদের ফ্যামিলি আমাদের পার্টির সমর্থক, আর আপনিও তাই করলে ভালো, প্রতিক্রিয়াশক্তি ভয়ানক ভাবে মাথা তুলছে।

সুশান্ত বলল, আর কিছু বলবে ?

সুশান্তদা, আপনারা এমন সিদ্ধান্তই নেবেন যা সরকারকে সাহায্য করতে পারে, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, মেয়েটাকে কি কিনে এনেছেন সুশান্তদা? অনিমেষ কেটে কেটে বলেছিল।

সুশান্ত লাইন কেটে দিল। বহ্নিশিখা আর লতা সামনে ছিল না বলে ঘটনাটি তার কাছেই রয়ে গেল। কিন্তু সে মনে মনে বিব্রত হলো। কী অদ্ভুত কথা বানিয়েছে ওরা ! কিনে এনেছে ? মানুষ কেনা বেচা! কী ভয়ানক! এমন মন গড়া গল্প যদি রটে যায় লতাকে তো রাখাই যাবে না নিজেদের কাছে। সে ভিতরের ঘরে গিয়ে বহ্নিশিখাকে জিজ্ঞেস করল, চন্দ্রিমা কে?

বহ্নিশিখা আর লতা বই দেখছে। পাঠ্যপুস্তক এবং সুকুমার রায়। লতা আবোল তাবোল বুকে চেপে আছে, বলছে, আমাদের সার বলত এই কবিতা, শুনেছ কি বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো / আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ......হি হি, আমার মুখস্ত।

বহ্নিশিখা বলল, কলিগ, ওকে পড়াতে হয় না, চন্দ্রিমা টিচার নয়, আমি আর নন্দিতাদি পড়াই।

ও কী করে? সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছে।

ক্লার্কের কাজ।

তাকে বলেছ লতার কথা ? সুশান্ত জিজ্ঞেস করে।

হু, সবাই তো জানে, আমাদের ইস্কুলে ক্লাস ফাইবে ভর্তি হোক, ওকে আমি তৈরি করে নেব। বহ্নিশিখা বলল।

না, অন্য ইস্কুল দেখতে হবে, তোমার ইস্কুল না। সুশান্ত বলেছিল।

বহ্নিশিখা অবাক। তখন কোনো কথা হল না আর। মেয়ের সামনে কথা হবে না। কিন্তু রাতে সব শুনতে শুনতে বহ্নিশিখা দপদপ করতে লাগল, বলল, খুব ভুল করেছি মিছিলে না নেমে, অনিমেষ ভাবছে আমরা ভয় পাই, আমি আমার ইস্কুলে এই সিজনটা পড়িয়ে নির্ঝরিণী কন্যা বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেব, তুমি কি ভয় পাচ্ছ কমরেড ?

ভয়ের কী আছে বহ্নি, কিন্তু বিপক্ষে গেলেই লতাকে রাখতে দেবে না কাছে। অনিমেষ সব জানে, শিশু শ্রমিক আইনে ফেলে দেবে।

যা করে করুক, আমরাও দেখি কী করতে পারে ও, অনিমেষ কী জানে, আমরা কি চুরি করে এনেছি? বহ্নিশিখা উত্তেজিত গলায় বলল।

রটিয়ে দেবে আমরা কিনে এনেছি, রাখতে দেবে না, কিন্তু আমরা রাখব ওকে এবং পরের মিছিলে যাবই। সুশান্ত গলা তুলে ডাকল, এই লতা, বহ্নিলতা ?

লতা ছুটে এল বই হাতে। বহ্নিকে জড়িয়ে ধরে, কী হয়েছে মা?

সুশান্ত তাকে জিজ্ঞেস করে, মিছিলে যাবি?

যাব, মিছিল বললেই সেই বিরামপুর থেকে মরিচঝাঁপি, কঠিন দেশ থেকে নরম দেশ, নিজির দেশে মিছিল করে আসা ! মিছিল করে টিশন, টিশন থেকে মিছিল করে শ্যালদা……।

মরিচঝাঁপি, তুই জানিস? সুশান্ত তার হাত ধরে নিথর হয়ে গেল প্রায়। চল্লিশ বছর আগের কথা বলছে বছর বারোর মেয়ে। সে চাপা গলায় বুঝি উচ্চারণ করে, কমরেড কিছুই ভোলনি তুমি, অযোদ্ধা পাহাড়ের ফুলমনি বেসরা, বুড়ি ফুলমনি আর মথুরগঞ্জের যমুনারানি মৃধা, কেউ তোমাকেও ভোলেনি ! জানালা দিয়ে বাতাসের ঝাপটা এল। বাতাস তেতে গিয়েছে আবার।

ছয়

অতনুর সঙ্গে সুশান্তর দেখা হয়েছিল শিয়ালদায়, কত শীত বসন্তের পর গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায়। লতা তখন ক্লাস ইলেভেন। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করেছিল। সুশান্ত বেলঘরিয়ায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল অতনুকে। অতনু রিটায়ার করেছে। সরকারি চাকরি করত। প্রমোশনে প্রমোশনে অনেকটা উপরে উঠেছিল। রিটায়ারের পর আবার ঢুকেছে। রি-এমপ্লয়মেন্ট এখন খুব হয়। অশক্ত হয়ে না পড়লে অবসর নেই সরকারি চাকরি থেকে। অতনু ফ্ল্যাট কিনেছে দমদম থেকে একটু পিছিয়ে এসে পাইকপাড়া উমাকান্ত সেন লেনে। খুব বড় তার এরিয়া। তিনটি ঘর, বড় লিভিং স্পেস, তিন টয়লেট, নিচে গ্যারেজ। তার লাল মারুতি গাড়ি সেখানে ঝিমোয় আরো অনেক গাড়ির সঙ্গে। কিনেছিল কিন্তু ব্যবহার করা হয় কম। সেই হাউজিঙে সব ফ্ল্যাট মালিকেরই গাড়ি আছে। সব গাড়িই প্রায় ঘুমোয়। ফ্ল্যাটে যাঁরা থাকেন, অধিকাংশের বয়স ষাটের উপর। বলা যায় বয়স্কদের আশ্রয়। ছেলেমেয়েরা বিদেশে কিংবা স্বদেশের অন্য রাজ্যে। বছরে কিংবা দুবছরে একবার আসে ক'দিনের জন্য। অতনুর একটিই মেয়ে। বিবাহের পর অদ্রিজা আমেরিকা মহাদেশের শারলট সিটিতে থাকে। উত্তর ক্যারোলাইনা রাজ্য। ঝাড়া হাত-পা যাকে বলে, অতনু তাই। কিন্তু এখন টের পায় ঝাড়া হাত-পা হয়ে সুখের চেয়ে অস্বস্তি বেশি। সে অফিস করছে, তার বউ কুন্তলা সমস্তদিন বাড়িতে একা। ইস! আর একজন কেউ যদি থাকত, কিছু একটা করার থাকত। মেয়ে বিদেশে চলে যাওয়ার পর জীবন খুব শ্লথ হয়ে গেছে। তারা তিনমাস ঘুরে এসেছে সেই দূর পশ্চিমের অতুল বৈভবের পৃথিবী থেকে। গ্রান্ড ক্যানিয়ন, নায়াগ্রা, লং ড্রাইভ, মনুষ্যবিরল হাইওয়ে, মিসিসিপি নদী, ১৪ ঘন্টা টানা উড়ানে অতলান্ত মহাসাগর পার হয়ে যেন নিঃস্ব হয়ে ফিরেছে। পাঁচদিন ঘরে বসা, দুদিন ঘরের বাইরে যাওয়া। অতনুর সাধ মিটেছে। অনেকদিন বাদে সে আবার লিখতে চেষ্টা করছে গোপনে। কিন্তু হচ্ছে না। কী করে হবে? এই অদ্ভুত নীরক্ত সফলতার কি কোনো কাহিনি হয়? গল্প হয়? কুন্তলা ফেসবুক করে। মেয়ের সঙ্গে কথা বলে মেসেজে। এক একদিন ভিডিও চ্যাট হয় মেসেঞ্জারে। হোয়াটস অ্যাপে ভিডিও কল। ইদানীং অতনুর মনে হয় ফুরায়েছে জীবনের সব লেনদেন। অফিসে যাচ্ছে, কিন্তু অফিস ভাল লাগে না। মনে হচ্ছে ছেড়ে দেয়। টাকার আর দরকার নেই। সন্ধের পর বাড়ি ফিরে কুন্তলার সঙ্গে টিভি ধারাবাহিক দ্যাখে। খবর শোনে। বিরক্তিকর ক্রিকেট দেখতে দেখতে ঝিমোয়। ঠিক এই সময় দেখা স্টেশনে সুশান্তর সঙ্গে। দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এসেছিল সে, 'অতনু না, তুই অতনু ? আমি ঠিক চিনেছি।

অতনু জিজ্ঞেস করে, আপনি, মানে তুমি?

আমি সুশান্ত, ভুলে গেলি, স্কটিশ, কেমিস্ট্রি, "সংক্রান্তি"।

এস মুক্ত কর মুক্ত কর
অন্ধকারের এই দ্বার……

নব জীবনের গান। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

ভেসে এল বুঝি নব জীবনের সেই গান। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অতনু বোস। সেই অতনু? বেলগাছিয়ার অতনু? গ্রামে যাওয়ার আগে যার সঙ্গে সারা দুপুর সেই পার্কে। সুশান্ত দৃপ্ত গলায় বোঝাচ্ছে, 'অতনু অতনু, তুই লিখতে চাস তো দুঃখ-দারিদ্রে ভরা ভারত দেশটিকে দেখতে হবে। মাটি আর মানুষ। তুই আমার সঙ্গে গ্রামে চ।'

অতনু বলেছিল, আমার বাবা রিটায়ার করেছেন, আমাকে উপার্জনের জন্য বেরতে হবে, আমার বোন রয়েছে, ভাই রয়েছে, দাদা তেমন কিছু করে না, আমি পারব না।

আমি কী করে পারছি অতনু, দেশের ভুখা মানুষ আমাদের দিকে চেয়ে আছে, সত্তর দশক মুক্তির দশক হবে, তোকে একটা বিপ্লবের গান লিখতে হবে, নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির 'ইস্পাত' লিখতে হবে।

মনে পড়ে, সব মনে পড়ে। ভেসে আসে প্রাচীন বাতাস। গলা বুঁজে যায় অতনুর, কাঁপতে থাকে, বিড়বিড় করে, সুশান্ত তুইইই ভালো আছিস? কেমন আছিস সুশান্ত? কতজনের কাছে খোঁজ করেছি। কেউ বলতে পারেনি, আমি তো ভেবেছিলাম...।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, মরে গেছে সুশান্ত, নারে, পারেনি মারতে, বেঁচে ফিরে এসেছিলাম, আবার আরম্ভ করেছি জীবন,তুই ভালো আছিস ?

আছি। বলতে গিয়ে থেমেছিল অতনু। ভালো আছে কি সত্যি ? সুগার হয়েছে। হাঁটুতে ব্যথা। বয়সের লক্ষণ যা যা সব হয়েছে তার। সে কথা চেপে অতনু জিজ্ঞেস করেছিল, ‘হ্যাঁরে তোর চুল পেকেছে শুধু, কিন্তু মাথায় এখনো অত চুল, তুই কেমন আছিস, তোর কথা শুনব, জেলে ছিলি, না গ্রামে?’

বন্ধু-আবিষ্কারের পরও সুশান্ত সেই বিরলকেশ প্রবীণের সঙ্গে মেলাতে পারছিল না চল্লিশ বছর আগের অতনুকে। একই অতনু, না অন্য কেউ? মুখের কাটা দাগটি একই রকম আছে। সেই অতনুই, না হলে সে চিনল কী করে? এখন তার চোখের জ্যোতি বেড়েছে মনে হয়। সব চিনতে পারে ইদানীং। সে বলল, জেলে ছিলাম অতনু। বেরিয়েছি সেই ৮১ সালে। কী করি ? কতকিছু করি ? বলব সব। শুনবি?

শুনব শুনব। হাল্ভাঙা নাবিকের মতো দিশাহারা অতনু আঁকড়ে ধরে সুশান্তকে। সুশান্ত বলেছিল, চ আমার সঙ্গে, হাঁটুতে ব্যথা তোর, সুগার?

তোর এসব নেই? অতনু জিজ্ঞেস করেছিল।

সুশান্ত মাথা নেড়ে বলেছিল, না নেই, হয়েছিল রে, তা ছ’বছর আগে, তখন লতা এল আমাদের বাড়ি, লতা আমাদের মেয়ে, লতা আসতে ব্যথাটা নিজে নিজেই সেরে গেল, সুগার ধরা পড়েছিল, কিন্তু আপনা আপনি চলে গেল কী করে বলতে পারব না, এখন কিছুই নেই,ঘুম হয় ভালো, ব্লাড প্রেশার স্বাভাবিক, লতা ক্লাস ইলেভেন, জীবনে প্রথম সফলতা।

আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। অতনু বলেছিল, বিদেশে থাকে, সব কিছু বিস্বাদ হয়ে গেছে সুশান্ত, সন্ধেয় বাড়ি ফিরে সিরিয়াল দেখি, পুরোন খেলা দেখি, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ি।

তারা বসেছিল দ্বিতল কাফেটোরিয়ায়। নিচে ট্রেনের ভোঁ, বহু মানুষের গলার স্বর ঢেউয়ের মতো বয়ে যাচ্ছিল। উপরেও ছিল গুনগুন। কথা হয়েই যাচ্ছে। কথার কোনো শেষ নেই। লতার কথা বলল সুশান্ত অল্প করে, শুধু বলল, আয়, আমি কেমন ভাবে বেঁচে আছি দেখে যা অতনু।

টিভি সিরিয়াল দেখিস না ? অতনু জিজ্ঞেস করেছিল।

না, দেখি না।

টিভির কোন্দল শুনিস না, অতনু জিজ্ঞেস করেছিল, ঘন্টা খানেক ঝগড়াঝাটি ?

সময় নেই। সুশান্ত বলে।

ক্রিকেট দেখিস না?

উঁহু, সময় কই?

সন্ধেয় বাড়ি ফিরিস সুশান্ত ? জিজ্ঞেস করেছিল অতনু।

ফিরি, না ফিরে কি উপায় আছে, বাড়ি আমাকে টানে যে, কাজ না থাকলে বাড়ি, মেয়ে পড়ে, আমরা শুনি চুপ করে, মেয়ে গল্প বলে, আমরা শুনি, কী ভাল আছি আমি।

লেটে বিয়ে ? জিজ্ঞেস করেছিল অতনু।

না, লতা এল যে অনেক পরে, না এলে সুগার হতো, হাঁটুতে ব্যথা হতো, মাথার চুল পড়ে যেত, দাঁতে ব্যথা, সবই তো ছিল রে আমার বলতে পারিস, পরিবারে ছিল তো। সুশান্ত বলেছিল।

হাঁটুর ব্যথা চলে গেল ! বিস্মিত হলো অতনু, কী করে গেল?

জানি না, লতা আসার পরই গেল।

কী লতা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে অতনু।

বহ্নিলতা, সুন্দরবনের, আমার বাড়ি আয়, বহ্নিলতা দেখবি, কবে আসবি বল, অনেক কথা আছে। বলল সুশান্ত, আয়, তোর কথা শুনব অতনু।

আমার আবার কী কথা, জীবনটা কেমন করে বয়ে গেল।

সুশান্ত বলল, আমি মেদিনীপুর , বাঁকুড়া, মালদা জেলে ছিলাম ১৯৭৬ থেকে, পাঁচ বছর, বেরিয়ে তোর খোঁজে গিয়েছিলাম, তোরা চলে গেছিস, আমি তোকে ভুলিনি অতনু, ভাবতাম তুই নিশ্চয় বড় লেখক হবি।

অতনু বলল, ১৯৭৬-এ আমি মেদিনীপুরে ছিলাম, কেরানীটোলায় অফিস।

তাই,আমিও তখন ওখানে, জেলের কুটুরিতে, জেল ভেঙে বেরিয়েই এসেছিলাম প্রায়, ধরা পড়ে যেতে বদলি করে দিল মালদা জেলে।

১৯৭৬-এ জেল ভাঙতে চাইছে সুশান্তরা। কোন মাস? এপ্রিল। তখন জেলখানার পাশ দিয়ে রিকশা করে অফিস যাচ্ছে অতনু। আবার রাজ কাপুরের ববির দর্শক হচ্ছে মহুয়া সিনেমা হলে নাইট শো-তে। ডিম্পল কাপাদিয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে মেসের বেডে শুয়ে তাকে নিয়ে গুনগুন করছে। তখন কোনো এক রাতে জেলখানার পাগলা ঘন্টি বেজে উঠেছিল। তারা কানাঘুষো শুনেছিল। এমারজেন্সি ছিল। কৌতুহল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। মনে পড়ল অতনুর। গায়ে রোঁয়া কাটল। কেউ কি মারা গিয়েছিল? কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ, তিমিরবরণ সিংহ এমন এক ঘটনা ঘটাতে গিয়ে কিংবা এমনি রাষ্ট্রের হিংসায় জেলখানার ভিতরে পুলিশের গুলিতে খুন হয়েছিল। অতনু কিছু জানে, অনেকটাই জানে না। তখন চাকরি করেছে চাকরি। অতনু বলল, শুনব, আজ আর নয়।

এস শিল্পী এস বিশ্বকর্মা
এস স্রষ্টা
দশরূপ মন্ত্র দ্রষ্টা
ছিন্ন কর ছিন্ন কর
বন্ধনের এই অন্ধকার।
আবার ভেসে এল নবজীবনের গান।

ঠিকানা নিল আর ফোন নং নিল অতনু। ট্রেনে দমদম নেমে গেল। দমদম থেকে রিকশা করে গা এলিয়ে উমাকান্ত সেন লেন। তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির নাম ‘আপনঘর’। বড় আবাসন। লিফট অবধি নিজেকে টেনে নিয়ে স্থির হলো। পায়ের ব্যথা খুব ভোগায়। আশ্চর্য ! সুশান্ত কেমন দৌড়তে লাগল ট্রেনের সামনের দিকে। অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল অতনু। এত বয়সেও সেই যৌবনকালের মতো ছুটতে পারে সুশান্ত। অতনু ফ্ল্যাটে ঢুকে কুন্তলাকে বলল, অদ্ভুত, কী এক লতার গুণে……

কুন্তলা বলল, সাধুর লতা?

না, বলল বহ্নিলতা, সুন্দরবনে জন্মায়। অতনু বলল। সোফায় গা এলিয়ে বসল সে। চুপ করে থাকে। আশ্চর্য, সে চিনতেই পারেনি সুশান্তকে। অথচ সুশান্ত তাকে চিনেছে। অফিস কলিগ যার সঙ্গে দশ বছর পাশাপাশি বসে কাজ করেছে, ক’দিন আগে মেট্রোয় দেখা, মুখোমুখি সিটে। তাকে শনাক্ত করতেই পারেনি।চুল ঝরে গেছে মেয়ের বিয়ের পর। সুগার বেড়েছে। ব্লাড প্রেশার। অতনু কিন্তু তার কলিগকে ঠিক চিনেছিল। অতনুর বদলানো চেহারা শনাক্ত করতে পারেনি সেই কলিগ। কুন্তলাকে সব বলতে আরম্ভ করল অতনু মুড়ি শশা খেতে খেতে। কী আশ্চর্য, টিভি বন্ধ করে দিয়ে পুত্র বধূর শাশুড়ি নির্যাতন দেখা বন্ধ দিল কুন্তলা, শুনতে লাগল সুশান্ত বৃত্তান্ত, অতনু অনেকটা বলে ঘন্টা দুই বাদে মোবাইলে ধরে সুশান্তকে, বাড়ি পৌঁছলি ?

হ্যাঁ, এই তোর কথা হচ্ছে, তুই আর আমি ‘ সংক্রান্তি’ আরম্ভ করেছিলাম তা শুনে লতা আর ওর মা বলছে তোকে দেখবে।

সংক্রান্তি! বের হয় মানে বের করছিস? অতনু অবাক। এও যেন নবজীবনের গান।

হ্যাঁ, অজ্ঞানতার বিপক্ষে সংক্রান্তি, বছরে চারটি বের হয়, লতাকে দিয়ে আমি লেখাব, ওর উচ্চ মাধ্যমিক হয়ে যাক, ও সুন্দরবনের কথা লিখবে, সুন্দরবনের মানুষের জীবন।

আমি? অতনু বলে উঠল।

তুই, কী লিখবি বল? জিজ্ঞেস করে সুশান্ত।

আচ্ছা যাই তো তোর বাড়ি, তুই কেমন ছুটলিরে, পারিস এখনো!

পারি, অসুবিধে হয় না।

হাঁপ ধরে না, বুক ধড়ফড় করে না? অতনু জিজ্ঞেস করেছিল।

সুশান্ত ওপার থেকে বলল, একদম না, অথচ বছর পনের আগে একবার কথা হয়েছিল পেসমেকার বসাতে হবে, ভালই আছি।

অতনুর মনে হয় সুশান্ত বানাচ্ছে। পেসমেকার বসানোর গল্পটি সত্য নয়। অমন কেউ ছুটতে পারে বছর চব্বিশের মতো। আচ্ছা সুশান্তই তো। অন্য কেউ নয় তো ? সেই সুশান্ত, ২২--২৩ এর তো নয়। এ অন্য সুশান্ত। অন্য কেউ।

ঠিক হলো পরের রবিবার যাবে সে সুশান্তর বাড়ি। সুশান্ত বলল, আয়, ভালো লাগবে তোর, আমরা পুরোন দিনের গল্প করব, ওরা শুনবে, দ্যাখ , অতীতের কোনো সীমা নেই, এই যে আমাদের বহ্নিলতা, ওর জন্ম এই সেদিন, ১৯৯৫-এ, কিন্তু ও ১৯৭৮-৭৯-র মরিচঝাঁপির কথা বলে, তার আগে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, দাঙ্গা, ১৯৬৪-তে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসার কথা, এক এক সময় মনে হয় ও চৈনিক বিপ্লব, রুশ বিপ্লবের কথা শোনাবে, মাওয়ের লং মার্চের কথা বলবে, ও যেন লং মার্চে হেঁটেছিল, যা পড়বে, যা শুনবে, সবই যেন ওর নিজের করে নেয়।

কী যে বলিস তুই সুশান্ত! অতনু উড়িয়ে দেয় অবিশ্বাস্য সব কথা। কিন্তু সুশান্ত বলে, তুই আয়, দেখে যা অতনু আমাদের বহ্নিলতাকে, গায়ে সুন্দরী আর গরাণ গাছের বন আর কাদামাটির গন্ধ পাবি অতনু,আয়।

সুতরাং অতনুকে যেতে হয়। যেতে হবেই। না গিয়ে উপায় নেই। বহুদিন বাদে যেন গা চনমন করতে লাগল, উৎসাহ এল মনে। ছন্দা বলল, সেও যাবে, একা বাড়ি থেকে কী করবে, রোববারে টিভিতে যে সিনেমা, তা অন্তত বার পনের দেখেছে সে, দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে স্বাভাবিক ভাবে। ড্রাইভার ডাকা হলো ফোন করে। বহুদিন বাদে গাড়িটি বেরোল গ্যারেজ থেকে। নিচে নামার আগে অতনু ফোন করল সুশান্তকে। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে তারা। কোন পথে যাবে, বিটি রোড ধরে ডানলপ পেরিয়ে কোন জায়গা থেকে ঢুকবে, কামারহাটির মোড়?

না না না, গাড়ি নিয়ে আসিস না, আমাদের বাড়ি লম্বা একটা ঘুরপ্যাঁচের গলি দিয়ে ঢুকতে হবে, গাড়ি ঢোকে না অতনু ওপথে, অনেক দূরে রেখে হেঁটে আসতে হবে তোকে, পায়ে ব্যথা বলছিলি না, অটো আমাদের বাড়ির সামনে আসে, ট্রেনে আয়, স্টেশনে অটো পাবি, বলবি বহ্নিলতাদের বাড়ি, শ্যামের গলি।

সাত

সিঙ্গুরের জন্য সেই মিছিলে যায়নি বটে সুশান্ত, কিন্তু ক'মাস বাদে নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাবের জন্য জমি অধিগ্রহণ রুখে দিয়ে পথে নামল মানুষ। রক্তাক্ত হলো বসন্ত দিন। সকালবেলায় গুলি চলল, মানুষ মরল। আবার খবর এলও অনেক। সত্য মিথ্যা অনেক রকম ভয় ধরানো খবরে নগর উত্তাল হলো। মানুষের মিলিত গর্জন শোনা যাচ্ছিল। শাসকদল দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। একের পর এক মিছিলে নগর ফুটছিল। বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ বুঝি ভেসে এল বহু যুগের ওপার হতে। এক মিছিলে একাই পা ফেলেছিল সুশান্ত। আর এক মহামিছিলে তারা তিনজন যাবে। এই সময় তাকে ফোন করেছিল অনিমেষ, সুশান্তদা, আপনি আজ না বের হলেই ভালো।

সুশান্ত অবাক, বলল, তুমি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছ অনিমেষ?

অনিমেষ বলল, আপনি একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছেন সুন্দরবন থেকে, সুশান্তদা, মাথায় রাখবেন, এই ঘটনা সম্পূর্ণ বেআইনি।

আমি আইন জানি অনিমেষ।

সুশান্তদা আপনি এটা পারেন না, মানুষ কেনা বেচা কি আইনসিদ্ধ ?

কী বলছ তুমি অনিমেষ! সুশান্ত হতবাক হয়ে ফোন হাতে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমরা খোঁজ নিয়েছি, আপনি অমুক তারিখে এক পুরোন নক্সাল কমরেডের সঙ্গে মথুরগঞ্জে গিয়েছিলেন, বিশ্বনাথ গায়েন, তার উপর পুলিশের নজর আছে, সুন্দরবন থেকে মেয়ে পাচার করা তার কাজ, অনেক করেছে, আমি ভুল বলছি কি?

সুশান্ত নিজের ভিতরে ফিরে এসেছিল, বলল, মনগড়া গল্প, লোকটাকে তুমি চেন না, ওদের কাছে ভগবান।

অনিমেষ বলল, সব রিপোর্ট আছে আমাদের কাছে, আপনারা টাকা দিয়ে এসেছেন মেয়েটার বাবাকে, কেন, দাম দিতে গিয়েছিলেন ?

আমি তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলব না অনিমেষ। সুশান্ত বলল।

আপনি রাগ করবেন না সুশান্তদা, আমরা সব জেনেও কি কিছু বলেছি, বলিনি, আপনার চিন্তা নেই, পার্টি আপনার পক্ষে আছে, আপনিও পার্টির পাশে থাকুন। অনিমেষ স্বাভাবিক হয়ে বলতে চেষ্টা করেছিল।

ফোন কেটে দিয়েছিল সুশান্ত। সেই সময় মিছিলে শহর অচল হলো। ডাক এল, মিছিলে এস সুশান্ত। আবার পথে নামো,পথেই হবে পথ চেনা।

মিছিলের খবর শুনে লতা বলল, আমিও যাব মা, মনে হয় কতদিন মিছিলে হাঁটিনি মা, সেই ঠাকমা যমুনাবুড়ি বলে মরিচঝাঁপি আসার কথা, তারপর আর মিছিল হলো কই !

বিস্ময়ে মেয়েকে দ্যাখে সুশান্ত। এইটুকু মেয়ে, এগার থেকে বারো, বলছে এমন কথা, যেন তাদের সঙ্গে মিছিলে হেঁটেই সে এ বাড়িতে এসেছে। মিছিল চেনে সে। মিছিল কি দ্যাখেনি তার দিদিমা ? তারা থাকে আর এক দ্বীপ ছোট মোল্লাখালি।

কোলে মা পুষ্পরানি তখন দু-বচ্ছর। খুলনা জেলার বড় গঞ্জ চুকনগর থেকে সাতক্ষীরে হেঁটেছিল সবাই ভদ্রা নদী পার হয়ে এসে। সেই মিছিল রাজপথে ছিল না। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, বন-বাদাড় পেরিয়ে, খাল পার হয়ে মিছিল হেঁটেই চলেছিল সাতক্ষীরের দিকে। ভোমরা বর্ডার বেশি দূর না সেখান থেকে। বর্ডার পার হয়ে বসিরহাট। খানসেনারা রওনা দিয়েছে যশোর সেনানিবাস থেকে, তারা চুকনগরের দিকেই আসছে। পথে দেশত্যাগী আতঙ্কিত মানুষের মিছিল দেখলে খানসেনারা কি ছেড়ে দিত? এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে মেরেই দিত সকলকে। কত খুন করেছিল মা খানসেনারা। মেয়েদের সম্মান নষ্ট করেছিল কত। রাজাকার, খান সেনা--সকলের রোষ যেন মেয়েমানুষের উপরই বেশি। অত্যাচার করে বুলি আর নৌরিনরে মেরেই ফেলল। আহা, মনে পড়লি চোখে জল আসে এখনো। আমরা দিনে লুকিয়ে থাকতাম বনে বাদাড়ে, শুকনো চিড়ে আর গুড় পেটে দিয়ে দিনমানে বিশ্রাম সব চুপ। রাতে জোছনায় হাঁটা।

তুই কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছিসরে লতা? বহ্নিশিখা অবাক।

হ্যাঁ মা, মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছি, এপারে এসে কেউ কেউ তো ফেরেনি, দিদমারা ফেরেনি ছোট মোল্লাখালি থেকে, ওখেনে দিদমার ভাইরা থাকত, দিদমা আসলে এপারের মেয়ে ছিল, বিয়ের পর ওপারে গিয়েছিল। লতা গুছিয়ে সব বলে।

তুই এত জানিস, জানলি কী করে? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

জানি মা, মনে পড়ে যায়, পথে কত ভয়, রাজাকারের দল যদি দেখতি পায়, আমিও ছিলাম যেন সেই মিছিলে,আমার মা-ও ছিল…… মনে পড়ে সব, চলো মা মিছিলে যাই। লতা বলেছিল বহ্নিকে জড়িয়ে ধরে, আমি একটু মিছিলে হাঁটব, কতদিন এমনি মিছিলে হাঁটিনি।

মেয়ের হাত ধরে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয়ে যাবে ধর্মতলা। সিঙ্গুরের তিনফসলী জমিহারা চাষীদের পক্ষে মিছিল বেরিয়েছে। কে এসেছে সঙ্গে, ও সুশান্ত?

আমাদের মেয়ে, বহ্নিলতা। বলতে বলতে, জবাব দিতে দিতে সুশান্তর বুক প্রসারিত হয়ে যায়।

বাহ, বহ্নিশিখার মেয়ে বহ্নিলতা, অগ্নিলতা, এইটুকু মেয়ে হাঁটছে !

এস মুক্ত কর মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার। হাঁটছে মেয়ে, মুখখানি হাসিতে ভরা। একটুও কষ্ট নেই এই প্রখর রৌদ্রে। যেন চাঁদের আলোয় হাঁটছে।

সেদিনের দু'দিন পর থানা থেকে পুলিস এসেছিল। একজন সাব-ইনসপেক্টার দরজায়। তখন রাত দশটা হয়ে গেছে। দরজা খুলেছিল সুশান্তই। পুলিস সময় বুঝেই এসেছিল। অনেক রাতে দরজায় পুলিসের কড়া নাড়া মানে ভয় দেখাতে আসা তা জানে বহ্নি আর সুশান্ত। পুলিসি অভিজ্ঞতা তাদের বিস্তর। মনে পড়ে গিয়েছিল এক কাস্টমস অফিসার সুরজিত দত্তর কথা। তার ফ্ল্যাটে মধ্যরাতে হানা দিয়েছিল পুলিশ। নিরীহ মানুষটির সঙ্গে নাকি মাওবাদিদের যোগাযোগ আছে। থানায় নিয়ে গিয়ে সমস্ত রাত জেরা। তারপর ক্রমাগত পুলিশি হানা। কোন মাওবাদি নেতার ডায়েরিতে নাকি তার ফোন নং পাওয়া গেছে। লোকটা চাপ সহ্য করতে পারেনি। রেললাইনে গলা দিয়েছিল। মামলা চলছে। বহ্নি আর সুশান্ত বুঝে নিতে থাকে, স্নেহ আর মায়ার পৃথিবী, ভালোবাসার পৃথিবী শেষ করে দিতে কেউই পিছ-পা নয়। রাষ্ট্রশক্তির কাজই তাই। রাষ্ট্রশক্তি জানে স্নেহ, মায়া, ভালবাসা মানুষকে জোটবদ্ধ করে। তা ভাঙতেই রাষ্ট্র তার দাঁত নখ বের করে আনে। এখানে পার্টি মনে করছে তার স্বার্থ রাষ্ট্রের স্বার্থ, যেহেতু সরকার সে-ই চালায়, মানুষের জীবন-যাপন, স্বপ্ন সবই তার নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা। তুমি মিছিলে গেছ। মেয়েটাকে নিয়ে গেছ। আমরা তা পছন্দ করছি না। সুতরাং মধ্যরাতেও পুলিস পাঠাতে পারি তোমার দরজায়। ভয়ে থাকো তুমি। ভয় থাকলে ভালবাসতে পারবে না, জোট বাঁধতে পারবে না।

মেয়েটাকে কোথা থেকে এনেছেন মিঃ রায়? সাব-ইনস্পেক্টার জিজ্ঞেস করল।

আপনাকে বলতে হবে? সুশান্ত ফুঁসে উঠেছিল।

নিশ্চয়, ও কি আপনার আত্মীয়? জিজ্ঞেস করেছিল এস,আই।

না, আত্মীয় নয়, আবার আত্মীয়ও নিশ্চয়। জবাব দিয়েছিল বহ্নিশিখা, নিজের করে নিয়েছি।

হেঁয়ালি করবেন না, যা জিজ্ঞেস করছি জবাব দিন, আপনারা নক্সাল করতেন, এখন কী করেন সে খবরও আমাদের কাছে আছে, বলুন মেয়েটিকে কেন এনেছেন সুন্দরবন থেকে ?

লালন পালন করতে। সুশান্ত জবাব দিয়েছিল।

দেখুন মিঃ রায় আপনি কেন এনেছেন তা পরিষ্কার করে আমাদের সব বলতে হবে, ডিক্লেয়ারেশন দিতে হবে, মেয়েটার ছবি সমেত সমস্ত ডিটেইল দিতে হবে থানায়, থানা তদন্ত করে দেখবে, আপনার বয়ান সত্য কি না।

তারপর ? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করেছিল।

সুন্দরবন অঞ্চল থেকে প্রচুর মেয়ে পাচার হয়ে যায় সারা বছর এইভাবেই, আপনাদের তেমন কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না বুঝে নিতে হবে।

বহ্নি রেগে গিয়েছিল, তার হাত চেপে ধরেছিল সুশান্ত। সাব-ইনস্পেক্টার বলল, আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে আপনারা মেয়েটিকে কিনে এনেছেন।

আর কী রিপোর্ট আছে? বহ্নি জিজ্ঞেস করেছিল।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা কী এমন লোক যে মিছিলে গেলাম বলে আপনাকে পাঠানো হলো?

আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে। সাব-ইনস্পেক্টার বলতে চেষ্টা করে।

থাকুক, আমরা যে পাচার করতে মেয়েটাকে আনিনি, আমরা যে তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি, সে রিপোর্ট নেই ? সুশান্ত খুব শান্ত গলায় বলেছিল।

তর্কাতর্কির পর পুলিস ওঠে। যাওয়ার সময় বলে যায়, মেয়েটার সব তথ্য থানায় দিয়ে আসতে। আরো বলে, মেয়েটাকে যে কিনে আনা হয়নি, এমন কোনো প্রমাণও দিতে হবে, দত্তক নিতে হলে কাগজে কলমে নিতে হবে, রেজিস্ট্রি করে নিতে হবে, সরকারের অনুমতি নিতে হবে, পুলিস ভেরিফিকেশন রিপোর্ট থাকতে হবে, মেয়েটির মা-বাবাকে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেবিট দিতে হবে।

সুশান্ত বলেছিল, রাত দশটার পর আসতে হলো এসব শোনাতে ?

এস,আই, ক্রুদ্ধ হতে গিয়েও সামলে নিয়েছিল নিজেকে। তারপর স্থান ত্যাগ করেছিল।

পুলিস চলে যাওয়ার পর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে লতা। তাকে জড়িয়ে ধরে বহ্নি, জিজ্ঞেস করে, ভয় পেয়েছিস পুলিস দেখে?

না, খান সেনা দেখেছিল দিদমা, মরিচঝাঁপিতি পুলিস কি দেখেনি ঠাকমা, দাদু, মা পুলিসে আমার ভয় নাই, মরিচঝাঁপি আসার আগে রায়পুর রেলস্টেশনে পুলিস কত মেরেছিল…………, মা পুলিশে আমি ডরিনে, আমি মথুরগঞ্জের মেয়ে।

পুলিস এসেছিল বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। আর কে এক সুশান্ত বোস, বহ্নিশিখা বোস মিছিলে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষের ভিতর, তারা গেলেই বা কী, না গেলেই বা কী তা বুঝতে পারছিল না থানা। অনিমেষের ক্ষমতা আছে। পার্টির কথায় থানা চলে। তাই সাব-ইনসপেক্টার গিয়েছিল ভয় দেখাতেই। এমন কাজ তাদের করতে হয়। কিন্তু মেয়েটা যে ইস্কুলে যাচ্ছে তা সত্য। বেশি ঝামেলা করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। এবং ওই দু'জনে টেঁটিয়াও বটে। বিপ্লবী অতীত তো। আসেনি থানায়। আর লোকাল কমিটির মেম্বর অনিমেষ বুঝেছিল,' ঘরে ঘরে ডাক পাঠাও, জোট বাঁধো তৈরি হও', তার বাবা-কাকাদের যৌবনকালের শ্লোগান ফিরে আসছে। জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার। মানুষ কী সুন্দর ঘরবন্দী হয়ে ছিল। টিভি দেখছিল, সিনেমা দেখছিল, চলচ্চিত্র উৎসবে আনসেন্সরড ছবি দেখছিল, সৌরভ গাঙুলীতে মজে ছিল, বাঙালির জাতীয়তাবাদে ডুবে গিয়েছিল সৌরভ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ছিল, ছেলে-মেয়েকে ইঞ্জিনীয়ার করতে, বিদেশে পাঠাতে জীবন পণ করেছিল, আর গাঁ-গঞ্জে মানুষ মাথা নত করে ছিল পার্টির কাছে। জন্ম মৃত্যু বিবাহ, সবই পার্টি নিয়ন্ত্রিত। সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভেঙে গেল আচমকা। কী করে সব ভুলে মানুষ পথে নেমে এল, সেইটা মাথায় ঢুকছিল না অনিমেষদের। তারা একবার ভাবছিল হাড় হিম করা ভয় দেখিয়ে সব থামাবে, আর একবার ভাবছিল, শান্ত হয়ে সবটা দেখে নিতে হবে। তারপর সময় ফিরলে, সব মানুষ ঘরে ফিরে গেলে ধীরে ধীরে ব্যবস্থা নিতে হবে। অনিমেষ পার্টি অন্ত প্রাণ। সে একটি পরিবারের কাছে হেরে গেল। আবার তার কথায় কেউ কেউ বাইরে না গিয়ে ঘরে বসে তার অজান্তে টিভিতে মিছিল দেখেছে। ঘরে বসেই পা মিলিয়েছে সহস্র পায়ে।

মেয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে। মেয়েকে নিজের ইস্কুলেই দিয়েছে বহ্নি। সঙ্গে নিয়ে যাবে, সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। ইস্কুলে বাবার নাম বলাইহরি মৃধা, মায়ের নাম পুষ্পরানি লেখা হয়েছে। তাহলে কেমন করে তোমার মেয়ে হলো বহ্নিদি? উসকে দিতে গিয়েছিল সেই চন্দ্রিমা, অনিমেষের পার্টি আর অনিমেষ যার কাছ থেকে লতার খবর পেয়েছিল।

বহ্নিশিখা বলেছিল, মেয়েতো আমার নয়, আমি মানুষ করব শুধু।

ও তো মা ডাকে তোমাকে, তোমরাই তো ওর মা বাবা। চন্দ্রিমা যেন জেরা করছিল তাকে।

বহ্নিশিখা বলেছিল, আমি মা, সুশান্ত ওর পিসে, যাদের জিনিশ তাদেরই তো থাকবে, সেইটাই তো বিধি।

চন্দ্রিমা মেয়েটি বছর পঁয়ত্রিশ, ধূর্ত চোখমুখ, বলে, তুমি লিখে দাও না ডটার অফ সুশান্ত রায় অ্যান্ড বহ্নিশিখা রায়, পাকা হয়ে যাবে, ওর সুন্দরবনের মা-বাবা খোঁজও পাবে না।

বহ্নিশিখা বুঝতে পারছিল চন্দ্রিমা তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। আর তা না হতেও পারে। মানুষ এমনি হয়ে গেছে। সততা অসততার তফাৎ বুঝতে পারে না। এমনিই তো করে সবাই। করলে কী হয়েছে ? ঘরে বসে বসে, টিভিতে জগত দেখে দেখে, মানুষ খুব স্বার্থপর হয়ে গেছে। বহ্নিশিখা বলেছিল, তা হয় না, তুমি বেআইনি করতে বলছ কেন?

তখন জমি অধিগ্রহণ নিয়ে গোলমাল চলছিল। প্রথম ধাক্কায় যে মিছিল রাজপথ প্লাবিত করেছিল, তা থেমেছিল। অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল নানা পরিকল্পনা করে আন্দোলনকে জীইয়ে রেখেছিল। আর ছাত্র-যুবরাও পথে নেমেছিল। এইভাবে সময় যাচ্ছিল। সুশান্ত টের পাচ্ছিল পায়ের তলার মাটি আগুন হয়ে উঠছে অনেক বছর বাদে। সেই বসন্তের আগুন। বজ্র নির্ঘোষ বুঝি শোনা যাচ্ছে আবার।

আট

এখন বর্ষা অনেক দেরি করে আসে। আগে আষাঢ় শ্রাবণে খুব বিষ্টি হতো মা।

হেসে ফেলে বহ্নি। পাকা বুড়ির মতো এমন কথা বলে মেয়েটা। আগে মানে কত আগে? অনেক বছর আগে। তখন আষাঢ় এলেই গুরুগুরু মেঘ,

ইশেনে মেঘ নৈঋতে মেঘ
মেঘ অগ্নি কোণে
বায়ু কোণ উজাইল মেঘে
উজাইল দিনমানে।

গুনগুন করে মেয়ে। সেই আষাঢ়ের মেঘ আর আসে না। কেন আসে না? সেই বিরামপুরা পোড়ার দেশ, সেই দেশে বৃষ্টিই ছিল না। পাহাড় আর পাহাড়, বন-জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, কেউটে সাপ। শুখা জমিতে জল পড়লে শুষে নেয় তো ফসল হবে কী করে। যবে বিরামপুরা, দন্ডকারণ্যে পাঠাল রিফিউজিদের তবে থেকেই আষাঢ়ের মেঘ উধাও হয়ে গেল। মেঘ তো তাহাদের পিছু পিছু সেই দেশে গিয়ে হারিয়ে গেল। সেই দেশ তো মেঘের দেশ নয়, যেমন ছিল না পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদেরও। উদ্বাস্তুরা ভিটে হারিয়ে গাঙ পানি, মেঘ বৃষ্টি হারিয়ে বিরামপুরায় গিয়ে পড়েছিল।

আষাঢ় গেল। শ্রাবণ গেল। ভাদ্র আসতে না আসতে মেয়ে উতলা হয় গাঁয়ের জন্য। সেদিন বিকেল থেকে নেমেছে খুব। নিম্ন চাপ হয়েছে বঙ্গোপসাগরের গভীরে। ঝড় আসছে। লতা বলল, খুব ভয় করে মা, সাঁই বাবুলে ঘিরে দিয়েছে বাড়ি, কিন্তু হাওয়া যখন ওঠে, সাঁইবাবুল ঠেকাতে পারে না।

কেমন করে? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

বাতাস ঠেকানর জন্যে সাঁইবাবুলের বন করতে বলেছে পঞ্চায়েত, কত বড় হলো কেডা জানে, ফি বছর ঝড়ে ঘর ভাঙে মা, বিষ্টিতে গাঙ উঠে আসে জমিনে।

বহ্নিশিখা কখনো সুন্দরবনে যায়নি। গ্রাম বলতে সে চেনে পুরুলিয়া, অযোদ্ধা পাহাড়, বেড়ো পাহাড়, জয়চন্ডী পাহাড়, মধুকুন্ডা, পছন্দপুর, রাঙামাটি, শালতোড়া..., সে প্রায় লতার বলা বিরামপুরার মতো দেশ, কিন্তু বহু বছরের কর্ষণে কর্ষণে নরম হয়েছে অনেক। সেই মাটি ফসল দেয়। আর ছোট-বড় পাহাড় থেকে মেঘও নেমে আসে। মেয়ে কত রকম মেঘের গল্প করে মা বহ্নির সঙ্গে। এত কি জানত বহ্নিশিখা ? বুঝতে পারে জীবনটা ফাঁকিই পড়ে গেছে, এখন যা শুনছে, তা বুঝি গতজন্মের কথা। বর্ষা নামল সেই ভাদ্রে। মেয়ে উতলা হয়। ভাদ্র মাসে তাদের চাষ নষ্ট হয় ফি-বছর। যে বছর বাঁচে, সে বছর পুণ্যের বছর। ভাদ্র এয়েছে মা, ভিটে পড়ল কি না কে জানে। মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি। কেউ দেয় গোলপাতার চাউনি, কেউ টিন লাগায়। টিনের চাল টেকে ভাল, কিন্তু তেমন বাতাস যদি ওঠে তা উড়ে চলে যায় গাঙের দিকে। এমনি হয়েছিল তাদের ইস্কুলে। কিন্তু মা আগের দিনে, যখন আমরা আমাদের সেই গাঙ কপোতাক্ষর ধারে থাকতাম, আম, কাঁটাল, সজনে, নিম, ডেওয়া, আর সুপুরি নারকেলে ঘেরা থাকত ভিটে, ঝড় বাদলে কিচ্ছুই করতে পারত না। গাছ গাছালি মানুষের জীবন বাঁচায় মা। ঝড় বাদল আটকায়।

তুই কী যে বলিস লতা!

আমি না, আমার ঠাকমা বলে। হাসে কালো মেয়ে। বহ্নিলতা।

শোনো মা, এদিকি গাঙ উঠে পড়ে মাঠ-জমিনে, আর সেদিকি যখন ঝড় আসে, শোঁ শোঁ শোঁ, বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ে, শোনো মা এক সন্ধের আগে সেই দেশে ঝড় এল, ভিটের টিনে এসে ধাক্কা মারে বায়ু, ঠাকমা শুধু গন্ডী টানে,

বায়ু কোণেতে পবন নন্দন
মহাবলবান
তি-ভুবনে নাহি বীর
যাহার সমান।
পশ্চিমে বরুণদেব
জলের অধিপতি
মেঘগণ সঙ্গে যার
সতত বসতি।
যাও মেঘ অই দিকে,
দূরদেশ পার
হইয়ো পবনদেবের
কন্ঠে পুষ্পহার।

ও মা, শোনো মা, বাতাস উঠলি এমন কইলে বাতাস দিক বদল করে চলে যায়। লতা বোঝায়।

বহ্নিশিখা বলে, তুই জানিস সব?

জানি মা, জানি, এমন ঝড় উঠল সেবার, সব ভিটের চাল উড়ে যেতে লাগল, তখন দিলাম মন্ত্র, বায়ু ঘুরে গেল, তারপর কী হলো যদি শোনো, একটা পাহাড়, তার নাম নিমকূট,, বায়ু সেই পাহাড় উড়ায়ে নিয়ে চলল, মা, মা, যদি দেখতে গগন দিয়ে নিমকূট পাহাড় উড়ে যায়, দশদিক আঁধার হয়ে আসে, অতবড় পাহাড়, ঝড়ে উড়ছে সে, এমন সে ঝড়ের শক্তি, আসলে সে তো পবনদেব, পবনদেব পাহাড় উড়োয় নিয়ে চলছে, সেই পাহাড়ে শুধু নিমগাছ, গাছেরাও উড়ছে, হ্যাঁ, মা সেই পাহাড়ি দেশে নাকি গাছেরা রাত্তিরে হেঁটে চলে বেড়াত, কত রকম ভূত-পেরেত চলে বেড়াত। গুণগুণ করে বলতে থাকে লতা।

তুই দেখেছিলি? হাসে বহ্নিশিখা।

হ্যাঁ, আমিই দেখেছি, হ্যাঁ দেখেছি, যে গাছটা যেখেনে থাকার কথা সে গাছটা সেখেনে নেই, একটা গাছ চলে গেল দশমাইল দূরে, আর একটা গাছ হেঁটে এল বিশ মাইল ওপার থেকে।

কেন হেঁটে এল? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

এমনি হেঁটে এল, কোনো কোনো গাছ আছে ভবঘুরে, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। বহ্নিলতা বলে।

কেমন গাছ সে ?

সে হলো সতীশবাবুর মতো। বহ্নিলতা নিশ্চিত হয়েই বলল।

সতীশবাবু কে?

তিনিই তো এসে বলেছিলেন নিজের দেশে ফিরতে হবে, সুন্দরবন, তিনি ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, মিটিং করতেন, বলতেন উদ্বাস্তুদের নিজ দেশে যেতে হবে, মানা ক্যাম্প, বেতুল জেলার ক্যাম্প, সব ঘুরে ঘুরে ওই কথা বলতেন, বড় গাছ, বটবিক্ষ মা। গতজন্মের কথা শোনায় যেন বহ্নিলতা।

মা মেয়ের কথা হয় রাত্তিরে শুয়ে। মেয়ে এমন কথা বলে, যা শুনতে কান পেতে থাকে সুশান্ত। সুশান্ত বলে, সবই ঠিক চলছিল। থিতিয়ে যাচ্ছিল উন্মাদনা। অনিচ্ছুক আর ইচ্ছুক চাষীর জমি নিয়ে দর কষাকষি চলছিল, কিন্তু পরের ফাগুনে নন্দীগ্রামের জমি দখল করতে গিয়ে আবার উত্তাল হলো সদর মফস্বল। শুনছিল অতনু আর কুন্তলা। তারা ট্রেনে এসেছে। তারপর অটো রিকশা। একসঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম, হুগলীর সিঙ্গুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা, শালবনি, নেতাই, লালগড় ----জঙ্গলমহল উত্তাল হয়ে উঠল। এসব খুব জানে কুন্তলা অতনু, তখন তাদের মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে। তারা কি পথে নেমেছিল? না নামেনি। তাহাদের তো ফুরায়েছে জীবনের সব লেনদেন। আর তাদের ফ্ল্যাট বাড়িতে এসে লোকাল কমিটি থেকে বলে গিয়েছিল, ঘরোয়া সভায় যেতে, সব মিথ্যে, যা ঘটছে তার চেয়ে বেশি বলছে লোকে, আপনারা আসুন অমুক তারিখে, আপনাদের সঙ্গে আমরা বসব, বুঝতে হবে সরকার কী চায়, আপনাদের সঙ্গে বসতে হবে।

সুশান্ত বলে, তাদের কাছে এক সকালে হাজির অনিমেষ কুণ্ডু, সহাস্য মুখে ডাক দিল তার নাম করে।

সুশান্ত বলে, তখন সকাল নটা, অনিমেষ এল একটি কার্ড নিয়ে, আজ বিকেল পাঁচটায় টাউন হলে মিটিং, আপনি আসুন, মন্ত্রী সব বুঝিয়ে বলবেন।

তখন লতা বেরিয়ে এসেছে। লতা খুব কৌতুহলী। শুনছে। লতাকে দেখে অনিমেষ বলল, বাহ, খুব ভালো আছ তো, নাম কী ?

বহ্নিলতা মৃধা।

বাবার নাম ? অনিমেষ যেন জেরা করছিল।

শ্রী বলাইহরি মৃধা।

তখন সুশান্ত বলেছিল, আমি তো অন্য কাজে থাকব ঐদিন, আমার তো যাওয়া হবে না অনিমেষ।

সে কী, কেন? অনিমেষ বিস্মিত হয়েছিল।

আমাকে চন্দননগর যেতে হবে অনিমেষ, জরুরি কাজ। সুশান্ত বলেছিল।

আমরা নির্বাচিত কিছু মানুষকে ডাকছি, আপনারা বুঝুন সরকার কী করতে চায়।

আমার কোনো উপায় নেই অনিমেষ, আমাদের এক কমরেড খুব অসুস্থ, আজ আমি যাব বলে কথা দিয়েছি, আমার জন্য শ্যামনগর স্টেশনে অপেক্ষা করবে একজন, গঙ্গা পেরিয়ে যাব।

কাল যাবেন না হয়। অনিমেষ অনুনয় করেছিল প্রায়, আমরা বিশিষ্টজনদের ডাকছি দাদা।

তুমি যাওনি? শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করেছিল অতনু।

না অতনু যাইনি। সুশান্ত বলে।

পারলে ? অতনু বিস্মিত হয়, তুমি জানতে সরকার বদল হয়ে যাবে, ওদের ক্ষমতা থাকবে না?

আমি তো গণক নই, যে সরকারই আসুক, আমি কী করব, তা নয় অতনু, আমাদের কমরেড আনন্দ মন্ডল তখন মৃত্যুপথে, আনন্দদার সঙ্গে রুটি ভাগ করে খেয়েছি পুরুলিয়ায়, জেল খেটেছি একসঙ্গে, উনি আমার চেয়ে বছরদশের বড় ছিলেন, অধ্যাপক ছিলেন বাঁকুড়ার একটি কলেজে, চাকরি ফেলে চলে এসেছিলেন বিপ্লবীদলে, আমি তাঁর খবর পাইনি বহুদিন, সেদিনই যাব ঠিক, আমি সেখানে না গিয়ে কেন যাব মন্ত্রীর সভায় তাঁর ছাত্র হতে ?

গিয়েছিলে চন্দননগর ? অতনু জিজ্ঞেস করেছিল।

সুশান্ত বলল, বহ্নিশিখা আর বহ্নিলতা, দুজনই গিয়েছিল আমার সঙ্গে।

অতনু আর কুন্তলা শুনছে বহ্নিলতাকে পাওয়ার বৃত্তান্ত। এখন আর লতাকে নিয়ে কোনো অসুবিধে হয় না। শুধু নখ-দন্তহীন অনিমেষ তার সঙ্গে কথা বলে না। দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। কথা বলতে গেলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, জবাব দেয় না। মন্ত্রীর সভায় না গিয়ে তার কথা অমান্য করেছে সুশান্ত রায়, সেই অপমান সে সহ্য করতে পারেনি। যেন সুশান্ত সেই সভায় গেলে অনিমেষরা ক্ষমতা হারাতো না। সে ঠারে-ঠোরে একে ওকে বলেছে, তখনই যদি ক্ষমতা প্রকাশ করে মেয়েটিকে সুন্দরবনে ফেরত পাঠাতে পারত, তাহলে সুশান্ত রায় আত্মসমর্পণ করত তার কাছে ঠিক। ক্ষমতাকেই সকলে মান্য করে। সুশান্ত রায় যে মেয়েটাকে কিনে এনেছে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। নখ-দন্ত হীন ব্যাঘ্রের তেজও কম নয়। যেভাবে হোক যে কোনো কারণে হোক সুশান্ত তাকে 'না ' বলেছে। আর তাই হয়ে উঠেছে গোপন প্রতিদ্বন্দী।

এখন বহ্নিলতা ক্লাস ইলেভেন। এখন বহ্নিলতা বড় হয়েছে। বহ্নিলতাই বলে চন্দননগর যাওয়ার দিনটির কথা। অতনু আর কুন্তলা অবাক হয়ে বনকন্যাকে দ্যাখে। আহা, গা দিয়ে এখনো যেন ইছামতি, গৌড়েশ্বর, রায়মঙ্গলের গন্ধ পাওয়া যায়। সেই গন্ধ কেমন তা তারা জানে না। দ্যাখেইনি ওইসব নদী আর নদীঘেরা দ্বীপ। কিন্তু আলাদা একটা গন্ধ, যা এই শহরে মেলে না, তাই। কালো রঙের মেয়েটি কী সুন্দর হাসে। মা বলে বহ্নিশিখাকে জড়িয়ে ধরে। মাসি বলে কুন্তলার হাত ধরল। জোড়হাতে নমস্কার করল অতনুকে, বলল, পিসের বন্ধু তুমিও পিসে।

বহ্নিলতা বলে, সেদিন ছিল মেঘলা। চন্দননগর না যেতে হলেও আমরা নিশ্চয় যেতাম না সেই সভায়। আমরা মানে পিসে। পিসের যাওয়া মানে আমাদের সবার যাওয়া। কেন যাবে পিসে? আমি তো হেঁটেছিলাম সেই ধর্মতলা পর্যন্ত। আমাদের তো মিছিলে হাঁটার অভ্যেস অনেকদিন। বিরামপুরা থেকে রায়পুর, দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু শিবির থেকে সুন্দরবন, মরিচঝাঁপি......।

কুন্তলা বলেছিল, বল মা বল।

কমরেড আনন্দ মন্ডলের বাড়ি যাব, আমরা ট্রেনে করে শ্যামনগর গেছি মাসি, ট্রেনে শুধু সেই সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামের কথা, কেউ বলে ঠিক, কেউ বলে অন্যায়। কেউ বলে, শিল্প হবে কীভাবে, আর একজন বলে, লোকের পেটের ভাত মেরে,

এদিকে লোকের মুখে দু'রকম কথাই শোনা যায়, দুই পার্টির কথাই একসঙ্গে চলে, কথা কইতে ভয় নেই, আমাদের মথুরগঞ্জে এক পার্টি, সে আমলে এক পার্টি, এ আমলেও এক, দুরকম কথা হয় না, হওয়ার উপায় নেই।

নয়

শ্যামনগর যেন আলাদা জায়গা। বন্ধ চটকল আর দেহাতি হিন্দিভাষী মানুষ। যে দাঁড়িয়েছিল তাদের জন্য সে হলো রামলাল দুসাদ। চটকলের মজুর ছিল। তা বন্ধ হতে কাটাকাপড়ের বিজনেস করে। খুব ইচ্ছে একটা লেদ মেসিন বসায়, এখন রট আয়রনের কাজ হচ্ছে সবদিকে। চেয়ার, টেবিল, খাট,ইত্যাদি। তার ফ্যাক্টরি ছিল বি টি রোডের ধারে। সেখানে বড় আবাসন হবে শোনা যাচ্ছে। চটকল, বিস্কুটকল, বেকারি সব বন্ধ করে আবাসন। রামলাল তাদের দেখে খুব খুশি। বয়স বছর পঞ্চাশ। যখন কমরেড আনন্দ মন্ডল এই এলাকায় পার্টি সংগঠিত করতে আসেন, তখন সে বছর পনের। সে ছিল কমরেডের ছায়ার মতো। পার্টিতে যোগ দিয়ে পাকুড়ে চলে গিয়েছিল। সাঁওতাল পরগণা। তবে জেলে যেতে হয়নি। পালিয়ে বেড়িয়েছে। তারপর নিজের কাকার কাছে গিয়ে উঠেছিল একেবারে অজগাঁয়ে। তাদের দেশও সাঁওতাল পরগণায়। ফিরে আসার পর চটকলে ঢুকেছিল। তখন সেখানেই কমরেডের সঙ্গে দেখা। কী অদ্ভুত লোক। কমরেড আনন্দ চটকলের প্রাইমারি ইস্কুলের টিচার হয়েছিল। বিপ্লব হবেই কমরেড। সংগ্রাম ফুরোয় না। একটা সংগ্রাম শেষ হয়, আর এক সংগ্রামের সূচনা হয়। কিন্তু কমরেড নিজেকে লুকোতে পারেনি। সংগঠিত করছিল শ্রমিকদের। এক বিপ্লবী তার কাজ ভোলে না। আর বিপ্লব তো একদিনে হয় না। সহস্র বছরও লাগতে পারে কমরেড। কাজটা ভুললে চলবে না। কমরেড আনন্দ মন্ডলের গা দিয়ে আলো ফুটে বেরোয়। তার কাজ গিয়েছিল। পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ইস্কুল থেকেই। তবে রাখতে পারেনি। তিনি জামিন পেয়েছিলেন পুলিস কেস সাজাতে না পারায়। কমরেড এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। তাঁর ইচ্ছে সুশান্তকে কিছু বলে যান। বহ্নিলতা কী সুন্দর বলে সব। বলল, তিনি একটা পাহাড় মা, তিনি একটা গাছ, কেউ টের পায় না পাহাড় চলে-ফেরে, গাছ চলে-ফেরে। স্টেশনের ধারের রাস্তা থেকে অটোয় করে অনেক দূর গেলাম। নেমে হাঁটতে লাগলাম চারজনে। হাঁটতে হাঁটতে দেখি এক গাঙ। আমাদের ওদিকে গাঙ কত বড়। একুল ওকুল দেখা যায় না। জল আর জল। কিন্তু ইনি মা গঙ্গা। মনে মনে অনেক বড়। বাবুঘাটের মা গঙ্গা আর শ্যামনগর, চন্দননগরের মা গঙ্গা একই। এদিকেও আছেন, ওদিকেও আছেন। গঙ্গা পার হয়ে অটোয় করে তাঁর বাড়ি। সেও গঙ্গার কাছে এক পুরোন বাড়ি। শোনা যায় ফরাসীদের কুঠিবাড়ি ছিল। তার সব ভেঙে পড়েছে, একটুখানিতে আলো জ্বলে। মাসি, আমি এই প্রথম বিপ্লবীকে দেখলাম। পাহাড় বসে পড়েছে, তাকে ভেঙেছে অসুখ। এখন তো পাহাড় ভেঙে ভেঙে উন্নয়ন হয়, তোমরা নিয়মগিরির কথা জানো, সেও এক চলে বেড়ানো পাহাড়, সেও এক হেঁটে বেড়ানো গাছ, ছায়া নিয়ে ঘোরে মা, আমি চিনলাম, তিনিই সতীশবাবু কিংবা বিমলবাবু।

সেই মরিচঝাঁপির কথা বলছিস ? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ মা, ঠিক যেন তাঁদের কেউ। বলে বহ্নিলতা। কী সুন্দর বলে। মাথা নাড়িয়ে চুল ঝাঁকিয়ে হাসি মুখে চোখে আলো জ্বালিয়ে বলে। বলে, যুদ্ধ কখনো থামে না মা, যুদ্ধ জারি থাকে সব সময়।

তুই এসব শিখলি কী করে ? কুন্তলা জিজ্ঞেস করে।

আমি জানি মাসি, জানি।

কী করে জানলি, তুই কি তখন জন্মেছিলি ? কুন্তলা অবাক হয়ে সব শুনতে চায়।

আমি যেন সব দেখেছি মা, শুনবা সেই কথা, আমাদের কী হয়েছিল সেই বন-পাহাড় ছেড়ে নিজ দেশে এসে। বহ্নিলতার চোখ দপদপ করে বলতে বলতে।

যখন মরিচঝাঁপি হয়, অতনু মেদিনীপুরে নিশ্চিন্ত চাকুরিতে, সুশান্ত বালুরঘাট জেলে। নিতাইহরি, বলাইহরি দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখছে। মরিচঝাঁপির বছর প্রবল বন্যা হয়। নদীগুলি একনাগাড়ে বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিয়েছিল জেলার পর জেলা। শুকনো ডাঙা, রেললাইন, নগর। কিন্তু বন্যা হয়েছিল ভাদ্র আশ্বিনে, ইংরিজি বছরের প্রথমে শীতের শেষে, মধ্য ফেব্রুয়ারি, ফাল্গুন মাস থেকেই মানা,মানাভাটা, বরদাভাটা, কুরুদ, নওগাঁ, সেই বিরামপুরা থেকে সবাই দেশে ফেরার কথা ভাবতে থাকে। সতীশবাবু, বিমলবাবু, রঙ্গলাল ডাক দিয়েছিল ফিরে চলো মাটির টানে। মরিচঝাপি যাত্রা করেছিল পনের বছরের বলাইহরি তার পঞ্চাশে বুড়ো তার বাবা আর মা ও বছরদুই বড় দিদিকে নিয়ে। সেই পাথুরে মাটির দেশের নির্বাসন ঘোচাতে মরিচঝাপি আসা। আসা মানুষের মতো বাঁচতে। বিমলবাবু, ধীরেনবাবু, সতীশবাবুকে সে দ্যাখেনি। বলাইহরি তার মেয়েকে বলেছে সেই দেশের সবচেয়ে বড় বড় পাহাড়ই যেন সতীশবাবুরা ছিল, সবচেয়ে বড় বড় গাছই সতীশবাবুরা ছিল। তাদের সব কাজ ছিল রাতে। দিনে পুলিশি নজর ছিল। পুলিশ টের পেয়ে গিয়েছিল দণ্ডকারণ্য, সতীশবাবু নামেই জানে সে। সতীশবাবু মানার সব ক্যাম্প আর বেতুল জেলার উদ্বাস্তু ক্যাম্পে গিয়ে তাদের এক হতে বলছিলেন। বিরামপুরা,

মানা, মানাভাটা, বরদাভাটা, কুরুদ, নওগাঁ ছিল মরুভূমি। তার বাবার আরো এক ভাই, দুই বোন ছিল, তারা মরেছিল ক্যাম্পে। সে যেন নাৎসি ক্যাম্প মাসি। তোমরা কেউ জানো না কী হয়েছিল।

তুই নাৎসি ক্যাম্প জানিস?

জানি, বহ্নিমা বলেছে, শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল আমাদের বিরামপুরা, মানা, মানাভাটা, বরদাভাটা সব অমনি ছিল, প্রায় অমনি, মানুষ যখন দয়ামায়া হারায়, অমনি করে হারায়, চোখের সামনে মানুষ না খেয়ে মরলে তেষ্টায় মরলে, তারা অমনি করেই নিজেরা ভাল থাকে, প্রাণে কোনো দুঃখ জাগে না।

অবাক অতনু বহ্নিলতার দিকে তাকিয়ে আছে। এ যেন ছিপছিপে কৃষ্ণকলি সতের বছরের এক কন্যা নয়, এ যেন শত শত বছরের কেউ। জগতের সব দেখেছে। এই মহাপৃথিবীর জন্ম মুহূর্ত থেকেই আছে পৃথিবীতেই। ধারণ করে আছে ক্লেদ আর মৃত্তিকার সমস্ত পূতিগন্ধ আর সৌরভ।

বহ্নিলতা বলছিল, কত মানুষ ভাত না পেয়ে জল না পেয়ে মরেছিল ক্যাম্পে। সেই মরুভূমিতে জলের চিহ্ন ছিল না। প্রত্যেকদিন জল আসত ট্যাঙ্কারে। জল নিয়ে কাড়াকাড়ি হতো। আমরা জলের দেশের মানুষ, শুকিয়ে মরে যেতাম যদি না বড় পাহাড় বড় গাছ ডাক দিত, ঘরে ফেরো। আমি সেই সতীশবাবুরে দেখলাম শুয়ে আছেন বিছানায়। গাছ ভূলুন্ঠিত হলে যেমন দেখায়, কান্ড শুকিয়ে যায়, পাতা শুকিয়ে যায়, শুয়ে পড়া গাছের একটুখানি প্রাণ রয়েছে তখনো, আমি চন্দননগরের কথা বলছি মাসি।

ঘরে আলো ছিল অপ্রতুল। বেশি আলো তিনি সহ্য করতে পারেন না। সবচেয়ে ভালো থাকেন অন্ধকারে। এক মহিলা ছিলেন, জাহানারা পারভিন। তিনি সেই মহাবৃক্ষকে বাবা ডাকছিলেন। তিনিই আনন্দ মন্ডলকে দ্যাখেন। সেবা করেন। সুশান্ত গিয়ে দাঁড়াতে তিনি যেন গন্ধ পেলেন। সুশান্ত, কমরেড ! ডাকলেন জাহানারাকে, তুলে বসা মা।

তুমি শুয়ে থাকো বাবা। জাহানারা বললেন, উঠে বসার শক্তি তোমার নেই।

তিনি শুয়েই থাকলেন। চোখ বন্ধ করলেন। বন্ধ করেই থাকলেন অনেক সময়। জাহানারা বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছেন, আপনারা বসুন, এই ঘুমিয়ে পড়েন এই জেগে ওঠেন, অভিমান হয়েছে তুলে বসাইনি বলে, শিশুর মতো হয়ে গেছেন।

লম্বা একটা বেঞ্চে সকলে বসে আছে। শুধু সুশান্ত গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়ায়। আবার তিনি চোখ খুললেন, চাপা গলায় বললেন, কমরেড, যুদ্ধ জারি আছে ?

হ্যাঁ, কমরেড। সুশান্ত শান্ত গলায় জবাব দিল। তার মনে পড়ে যাচ্ছিল একটি রুটি দুভাগ করে খাওয়ার কথা। মনে পড়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে মধুকুন্ডা নেমে পাহাড়ি পথে হাঁটা। মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে দুজনে। পাতলা জোছনা। তাঁরা যাবেন অর্জুন মাহাতোর বাড়ি পেঁচাবিন্ধ্যা গ্রামে। যেতে যেতে তিনি বলছেন, বিপ্লবের গান উপন্যাসের কথা। বিপ্লবের গান পড়েছে সুশান্তও। সং অফ ওয়াং হাই। গণফৌজের সেই সাধারণ সৈনিক কী করে অসাধারণ হয়ে উঠল সর্বহারার প্রেমে, পার্টির প্রতি বিশ্বস্ততায় সেই কথা বলতে বলতে চলল। আনন্দ মন্ডল বলছিলেন, গণ মুক্তিফৌজ গড়তে হবে। গণফৌজ যাত্রা করবে পাহাড় থেকে সমুদ্রে। তুমি সেই ওয়াং হাই, মনে আছে তার কথা?

সে কই? তিনি যেন খুঁজলেন কাউকে, সেই যে এক বনলতার কথা বলল কে যেন।

কে বলল? শিহরিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বহ্নিলতা।

তিনি বললেন, তিনি নাকি স্বপ্নে পেয়েছেন, এক বহ্নিলতা লালন করছে কমরেড সুশান্ত।

কে বলল? সুশান্ত চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল জাহানারাকে।

জানি না, স্বপ্ন ছাড়া কী আর দেখবে বাবা, যা দেখেন উনি সবই স্বপ্ন, কে আর আসে, রামলাল দুসাদ গঙ্গা পার হয়ে, আর চুঁচড়োর ললিত পাল, মগরার অমিতাভ সরকার, নীলিমা। বলল জাহানারা।

সুশান্ত বলেছিল, এদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। তাহলে কী করে তাঁকে খুঁজে বের করলেন কমরেড আনন্দ। কমরেড আমি সেই ওয়াং হাই, গণফৌজের জন্য বসে আছি, কমরেড।

সে কই? তিনি ঘাড় ঘুরিয়েই বহ্নিলতাকে দেখলেন। আলো ঝলমল হয়ে গেল তাঁর চোখমুখ। জাহানারাকে বললেন, আলো জ্বালিয়ে দে, জ্বালিয়ে দে মা।

জাহানারা বললেন, আর আলো কই, এইতো আলো বাবা।

তিনি শান্ত হয়ে বললেন, আমি তাহলে ভুল স্বপ্ন দেখিনি কমরেড?

সুশান্ত বললেন, স্বপ্ন ভুল হবে কেন?

আমি জাহানারাকে বললাম তোমাকে খবর দিতে, বহ্নিলতা লালন করছে কমরেড সুশান্ত রায়।

জাহানারা বললেন, হ্যাঁ, তাইই, এক সন্ধ্যায় বাবা বললেন চারদিক অশান্ত, মিছিলে মিছিলে মাটি কাঁপছে, বন-পাহাড় সুন্দরবনের দ্বীপ-দ্বীপান্তর থেকে এক বহ্নিলতা নিয়ে এসেছে কমরেড সুশান্ত, তাকে একবার খবর দিতে হবে।

কী করে খবর দিলেন? সুশান্ত জিজ্ঞেস করে জাহানারাকে।

জাহানারা বলল, রামলালকে বললাম, সে বলল, খুঁজে বের করবে।

সুশান্ত রামলালের দিকে তাকাতে সে বলল, শ্যামনগর ইস্টিশনে সন্ধেবেলায় কত মানুষ নামে, আমি ইস্টিশনে বসে থাকলাম কদিন বিকেল থেকে। কতলোক ফেরে কলকাতার দিক থেকে, কতলোক ফেরে রাণাঘাটের দিক থেকে, কাউকে কাউকে আমি জিজ্ঞেস করছি সুশান্ত রায়কে চেনে কি না, কে সুশান্ত রায়? কত সুশান্ত রায় আছে, কোন সুশান্ত রায়ের কথা বলতে চাইছি আমি? তখন আমি বুকে সুশান্ত রায় নামে একটা পোস্টার ঝুলিয়ে বিকেলে বসতে, একদিন একটা বুড়ো মতো লোক এসে জিজ্ঞেস করল, কোন সুশান্ত রায় ?

কমরেড সুশান্ত রায়। আমি বললাম, কমরেড আনন্দর ইচ্ছা তাকে আবার দ্যাখেন, কিছু বলে যান।

সুশান্ত রায় সুন্দরবন থেকে একটা মেয়ে এনেছে, বহ্নিলতা নাম, তাই তো ?

আমি আন্দাজে বললাম, হাঁ, সেইই হবে। তখন লোকটা তার নম্বর দিল। আমি ফোন করলাম তার পরদিন সকালে। কিন্তু সেই লোকটা কে, যে ফোন নম্বর দিয়েছিল ? রামলাল বলল, তা সে জানে না, কিন্তু এইভাবে সে কমরেডের নম্বর পেয়েছিল। লোকটা আর কোনো কমরেড হবে। বন্ধু। বন্ধু। কেমন দেখতে। এমনি দেখতে। লোকটার চেহারায় এমন কোনো বৈশিষ্ট ছিল না যা দিয়ে তাকে মনে রাখা যেতে পারে। শাদা-মাটা, প্যান্ট আর ফুল শার্ট,মাথায় অল্প চুল, চোখে চশমা, কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তাকে সে শ্যামনগরে দেখেছে আগে, তাই মনে হয়। কিন্তু লোকটাকে আবার দেখলে সে চিনতে পারবে এমন কোনো কথা সে জোর দিয়ে বলতে পারে না। তারপর রামলাল একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, লোকটা আপনার মতোও হতে পারে কমরেড সুশান্ত।

সুশান্ত গত একমাসের ভিতরে এদিকে আসেনি। কিন্তু এমন কেউ এসেছে যে জানে বহ্নিলতার নামও। বহ্নিশিখার ইস্কুলের অনেকে জানে এই বৃত্তান্ত। আর জানে অনিমেষ। অনিমেষ একা জানে তা নয়, থানা জানে যেমন, তার পার্টির কেউ কেউ জানে। একজন থেকে আর একজন। এমনি কেউ জেনেছিল আর সে এসে পড়েছিল শ্যামনগর স্টেশনে।

শুনতে শুনতে সুশান্ত বলল, ক'দিন সে আনন্দদার জন্য উতলা হয়েছিল সত্য, এমন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে মাটি, চারদিকে মানুষের পদধ্বনি, আনন্দদা, তুমি কোথায়, মিছিলে মিশে গেছ? তখনই ফোন এসেছিল। কে যে তার খবর দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল, সুশান্ত রামলালের দিকে তাকিয়ে থাকে। রামলাল বলল, কমরেড, আমি তো লিখাপড়া জানি না, বাংলায় নামটা লিখে দিল আমার বেটা, সে দুকান করে, আমার কী মনে হয়, বিপ্লব যেমন স্বপ্ন হয়, এইটা স্বপ্নই হবে, আমি কিছু বলতে পারব না আর, লোকটা ঐটা বলতেই যেন শ্যামনগরে নেমেছিল সেদিন, আমাকে সব লিখে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ফিরতি গাড়ি কখন, বিশ মিনিট বাদেই ছিল, সে বসে থাকল খালি বেঞ্চে, আমি দেখতে লাগলাম, তারপর গাড়ি আসতে উঠে গেল, কেমন হলো বলুন সবাই।

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল অতনু আর কুন্তলা, তারা জিজ্ঞেস করে, তারপর কী হলো।

বহ্নিলতা বলল, উনি মানে কমরেড আনন্দ বললেন, উনি বুঝতে পারছেন স্বপ্ন সত্যি হয়।

সুশান্ত বলল, এর দুদিন বাদে এক সন্ধ্যায় কমরেড আনন্দ তাঁর যৌবনের কথা বলতে বলতে ঢলে পড়লেন। সেদিন বহ্নিলতাকে পথে উত্যক্ত করেছিল দুই যুবক। তাদের দিকে সে রুখে গিয়েছিল। তারপর অবশ্য আর কিছু হয়নি। সেদিন অনিমেষ পথসভা করে আমাদের শাসিয়েছিল নাম না করে। সেদিন পুলিশ যথেচ্ছ লাঠি চালিয়েছিল বহুজনের মিছিলে। নন্দীগ্রাম থেকে বহু মানুষ পালিয়েছিল। নয়ই মারচ গুলি চালিয়ে নন্দীগ্রামের দখল নিয়েছিল সরকার এবং পার্টি। কিন্তু যুদ্ধ জারি ছিল। যে কোনো পক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করলে অন্যপক্ষকে যুদ্ধে নামতে হয়। তবে মরিচঝাঁপির যুদ্ধ একতরফা হয়েছিল। নিরস্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্রের যুদ্ধ।

দশ

মরিচঝাঁপির পথে হাসনাবাদে পৌঁছে আটকে গিয়েছিল মিছিল। মিছিলই। আসার পথে কতবার প্রতিহত হয়েছিল তাদের যাত্রা। মধ্যপ্রদেশ সরকার চেষ্টা করেছিল পুলিস পাঠিয়ে আটকে দিতে, যেন নাৎসি শিবির থেকে পালাচ্ছে নিরপরাধের দল। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধ পালন করেছিল তারা। মিছিল করে তারা হয় অন্ধ্র না ওড়িশায় প্রবেশ করে ট্রেনে চেপেছিল। হাওড়া। হাওড়া থেকে মিছিল গেল শিয়ালদা। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে হাসনাবাদে এসে মিছিল থামল। হাসনাবাদে এসে তারা শুনল, সুন্দরবনে প্রবেশ করতে দেবে না নতুন সরকার। সরকারের মন্ত্রী, শরিকদলের নেতা মিটিং করে ডেকে এলে কী হবে, বিরোধী পক্ষ থাকার সময় আশ্বাস দিলে কী হবে, এখন তাঁরা বলছেন, সকলে ফিরে যাক। যেতেই হবে। এত মানুষের

ভার নতুন সরকার নেবে না। সরকার আর দল আলাদা। সরকারের প্রধান বলেছেন, না ফিরে যেতে হবে। সুন্দরবন নষ্ট করা যাবে না। প্রশাসন নদী পারাপারের নৌকো বন্ধ করে দিয়েছে। হাঙর, কুমির, কামটে ভরা খরস্রোতা নদী সাঁতরে তো পার হওয়া যাবে না। হাসনাবাদের নদী আর জল দেখে নিতাইহরির ছেলে বলাইহরি অবাক। তার বছর পনের-ষোল বয়স, জ্ঞান হওয়া থেকে সে দেখেছে শুখা মাটি শুখা নদী, জলের অভাব। মায়ের কথা, বাবার কথা বিশ্বাস হতো না, জলের দেশ কেমন তা সে দ্যাখেনি। সে মনে মনে ভেবেই নিয়েছিল, একবার যখন আসতে পেরেছে, আর ফিরবে না। রাতে তার বাবার কাছে শুনেছিল তাদের ওপারের দেশের কথা। ইছামতীর ওপার বাংলাদেশ, তখন ছিল পাকিস্তান। আয়ুবশাহীর রাজত্ব। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল আয়ুবের লোকজন। পাকা ধান লুট করেছিল। যুবতী মেয়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। বেতনা নদীর ধারের গোটা গ্রামই রাতভর হেঁটে সাতক্ষীরে হয়ে ভোমরা সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। বসিরহাটে উদ্বাস্তু শিবির, তারপর লরি ভর্তি করে হাওড়া স্টেশনে চালান। সেখান থেকে ট্রেনে চাপিয়ে দণ্ডকারণ্য। সেই যে আয়ুব শাহীর আমলে মিছিল শুরু হয়েছিল, তা যেন চলছিল, থেমেছিল হাসনাবাদে এসে। যাদের আশ্বাসে এসে পৌঁছেছিল নিজদেশে, তারা তো মুখ ফিরিয়ে নিল। বুঝলে মাসি, কেউ ফিরেও তাকায়নি। তখন বসিরহাট থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত পথের ধারে, রেললাইনের ধারে, রেলস্টেশনে শুধু রিফিউজি। সরকার বেঁকে বসেছে। সুন্দরবনে ঢুকতে দেবে না, পুলিস এসে বলে গেল, ফেরত যাও, নদী পার হতে সরকারের বারণ আছে। ফেরত না গেলে ভেঙে দেওয়া হবে শিবির। রাতে চোখ রাঙিয়ে গেল কিছু লোক, গাঙ পেরুলিই মরবা, যেখেনে ছিলে সেখেনে ফেরত যাও, সে দেশে কি মানুষ থাকে না?

আমাদের হরিশবাবু বাবু এগিয়ে গিয়ে বলল, না থাকে না, মালকানগিরি, দন্ডকারণ্যে থাকলি বুঝতে, আমরা সুন্দরবনে ঘর বাঁধব, আমাদের সাহায্য করেন আপনারা, আমরা আপনাদের ভাই-বুন, বাপ-মা।

কেডায় সাহায্য করবে, পার্টি বলেছে হটিয়ে দিতি, তোমরা চলে যাও, থাকলে মরবা, যদি আগুন লাগে তোমাদের ছাউনিতে, কেউ বাঁচাবে না, মেয়েছেলে লুট হয়ে যাবে।

কথাটা যেন আগুনেই ঘি ঢেলে দিল, হেই হেই করে উঠল জ্বলন্ত কয়েকটি চোখ। নিতাইহরির ছেলে বলাইহরি লাফ দিয়ে ধরল একটা শীর্ণকায় লোকের ঘাড়, এই কী বলতিছিস, মেয়েছেলে লুট করবি, আগুন দিবি ছাউনিতি, দেশটা তোর বাপের, জমিদারের বেটা জমিদার, আমরা কি ভেসে এইচি?

তারা পালিয়েছিল। কিন্তু রাতভর কেউ ঘুমোয় না। ঠিক হলো নৌকো দখল করে নৌকো নিয়ে পাড়ি দিতে হবে অথৈ গাঙে। হরিশবাবু এখানকার নদীপথ চেনেন। তিনি ওপারের মানুষ, যখন দেশ অখন্ড ছিল তিনি নৌকো নিয়ে এদিকে কত এসেছেন। কুমিরমারিতে তাঁর বোনাইয়ের ভাই থাকে। ছোটমোল্লাখালিতে তাঁর পিসি থাকে। হরিশবাবু ছিলেন শহিদ ভাটা ক্যাম্পে। শহিদ ভাটা ক্যাম্প হলো মানা ভাটা ক্যাম্পের নাম। তখন বাংলায় পুনর্বাসনের দাবিতে সব ক্যাম্পে আন্দোলন চলছিল। আমরণ অনশনে বসেছিল উদ্বাস্তুরা। গুলি চলে   কুরুদক্যাম্পে। মানা ভাটা ক্যাম্পে গুলিতে মারা যায় জনাদশ ব্যক্তি। সেই শহিদ ভাটা ক্যাম্পের হরিশবাবুর নেতৃত্বে শেষ রাতে নৌকো দখল করে মরিচঝাঁপি যাত্রা করেছিল লোকে। মাসি দেশের খোঁজে এয়েছিল তারা, কিন্তু সরকার বলল, ফিরে যেতে হবে, এদেশে কাউর জায়গা নেই। সরকার পুলিশ পাঠিয়ে মারতে লাগল। সরকার চাল গম ঢোকা বন্ধ করে দিল, না খাইয়ে মারবে উদ্বাস্তুদের। তাই হয়েছিল। গাঙের ভিতর রিফিউজি ভর্তি নৌকো ডুবিয়ে দিল সরকারের পুলিশ গুলি চালিয়ে নৌকো ফুটো করে দিয়ে। মেয়ে-পুরুষ-শিশু সমেত নৌকো ডুবে গেল।

সুশান্ত বলে, যা জানতাম না, সব জেনেছি বহ্নিলতার কাছে, কেমন করে সব জানল বুঝতে পারি না।

হ্যাঁ, বহ্নিশিখা বলে, তার মেয়ে কেমন করে তাদের পূর্ব পুরুষের দেশ সেই এক গ্রাম যুগীপোতার কথা বলে। সব যেন তার চোখে দেখা। যখন বলে তখন শ্রোতাও দেখতে পায় সব। বহ্নিশিখা দেখতে পায় বেতনা নামের এক ছোট নদীর ঘাট সুপুরিঘাটাকে। নদীটা কোথা থেকে এসেছিল কে জানে, মিশেছিল কপোতাক্ষ নদে। একবার তার ঠাকুরদা মাটির হাঁড়িকুড়ি নিয়ে কপিলমুনির সংক্রান্তির মেলায় গিয়েছিল বেচাকেনা করতে। কপিলমুনি কপোতাক্ষ নদের ধারে এক গঞ্জ। কুমোরের চাক ছিল তাদের বাড়ি। তো সেই মেলাতেই দেখেছিল তার ঠাকমা যমুনারানিকে। যমুনার তখন বয়স কত বারো-তের। লাল ডুরে শাড়ি পরে মায়ের সঙ্গে এসেছিল পৌষ সংক্রান্তির মেলায়। পছন্দ হলো তো যুবক সব জেনে নিল মেয়ের কাছে, বাড়ি কোথায় হলো, বাপের নাম কী? লক্ষ্মীর ঘট তুমি নিয়ে যাও। রঙিন লক্ষ্মীর ভান্ড পছন্দ করেছিল মেয়ে, এক পয়সা, ফুটো পয়সা, দুই পয়সা ফেলবে তাতে।

না, আর পয়সা নেই যে। মেয়ের মা বলেছিল। তারা হাতা কিনেছে, খুন্তি কিনেছে, এনামেলের সানকি কিনেছে, হাত খালি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, চোখের দেখা দেখছিল। যুবক নিতাইহরিও দেখল চোখের দেখা। মুখখানি কী শান্ত। চোখদুটি

কিন্তু চঞ্চল। মায়ের হাত ছাড়িয়ে বেরোতে চাইছে, মা আঁকড়ে রাখছে মেয়েকে। হাত ছাড়ছেই না। সোমত্ত মেয়ে। রাখতে পারবে না কাছে তা জানে, তাই যেন বেশি করে ধরে রাখা। কিন্তু মেয়ের ভবিতব্য তো মানতে হবেই।

আমি এমনি দিচ্ছি, নি যাও মা, ওর পছন্দ হয়েছে যহন, নি যাও, লক্ষ্মীর ঘট, না করতি নেই। মেয়ের মা তো পুরুষের চোখ দেখে বুঝেছে। চোখে চোখে মিলেছে যে। লক্ষ্মীর ঘট মেয়ের হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে নিতাইহরি জিজ্ঞেস করেছিল, নামডা কী যেন খুকি ?

যমুনা। বলে মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

আমি কদমতলিতে রই। বলে গুনগুন করে ওঠে নিতাইহরি, আমি তুমার বাড়িতি লোক পাঠাব, কোন গাঁ মা, মোর গাঁ যুগীপোতা, বেতনা গাঙের ধারে, মুরা আসলে পাল, কিন্তু চাষাবাদ এখন ভরসা, মুই তবুও গড়ি হাঁড়িকুড়ি, পেদীপ পিলসুজ, গেলাস বাটি, মাটির গাড়ি।

বেশ বাবা, যাই।

ঘর কুথা হলো মা? নিতাই তো জানবেই, না জানলে যমুনারানিকে নিয়ে নৌকোয় করে সুপুরিঘাটায় নামবে কী করে? নাম বলবে বলবে করে বলেনি মেয়ের মা। মেয়ে তো। কেন এত খোঁজ দেবে। গাঙের দিকে হাঁটছিল যমুনার মা যমুনাকে নিয়ে। নৌকোয় উঠতে পারলে বাঁচে। মেয়ের কত বুদ্ধি। মায়ের অজান্তে হাত বাঁকিয়ে দেখিয়ে দিল। বাঁকিয়ে দিল হাত। বাঁকায় ঘর। বাঁকা কপোতাক্ষর কুলে। নিতাইহরি ফিরতি পথে পরেরদিন বাঁকায় গিয়ে খোঁজ নিল এক গয়লা ঘোষের কাছে। ছানা নিয়ে গিয়েছিল কপিলমুনির বাজারে। বাঁকায় ঘর। যমুনা মেয়ের নাম। বাপের নাম ছিকান্ত দাস। বাপের নাম মেয়েই বলে দিয়েছিল তার মায়ের সামনে সে জিজ্ঞেস করায়। মা তো তাঁর পতির নাম ধরবেন না। ঘোষ বলেছিল, হুঁ, চিনবে না কেন, ছিকান্ত তাঁতির কথা বলছ, হাঁ বাঁকায় বাড়ি।

ছিকান্ত তাঁতি, আকা-বাঁকা বাড়ি,
মেয়ে তার পরিসে, লাল ডুরে শাড়ি।
অমুকহরি ছিরিহরি, যুগীপোতা ঘর,
সেই হরি হইলো যমুনার বর।
বেতনার ঢেউজল, কপোতাক্ষয় মিশে।
শুনা যায় ঘোষ ছিল যমুনার পিসে।

বহ্নিলতা রাতে মা বহ্নিশিখার সঙ্গে শুয়ে গুনগুন করে । শোয়ার পর একটি ঘন্টা যায় শুধু কথায় কথায়। তার ঠাকমা যমুনারানি নিজের বিয়ে নিয়ে নিজেই শ্লোক বানিয়েছে। বুড়ি পারেও বটে। স্বামীর নাম নেবে না, তাই নিতাইহরি হলো অমুকহরি। বুড়িই নাকি বলেছিল, একবার যখন সেই নরক থেকে আসতে পেরেছে, গাঙে ডুবে মরবে, তবু আর বিরামপুরা ফিরবে না। আর গাঙে ডুবে মরবেই বা কেন, ওপারে চলে যাবে, যুগীপোতা, বেতনার ঘাটে গিয়ে উঠবে। যমুনারানির বিবাহ বৃত্তান্ত বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে মেয়ে। বহ্নিশিখার ঘুম আসতে দেরি হয়। এতকাল বাদে জীবনের একটা মানে বোঝা যাচ্ছে।

বছরে দুবার গাঁয়ে যায় মেয়ে। গরমের ছুটিতে আর পুজোয়। সেই ফাল্গুনে নন্দীগ্রামে গুলি চলল। তারপর থেকে মিছিল আর মিছিল। মানুষ যে ঘরের বাইরে বেরিয়েছে, আর যেতেই চাইছে না। বরং যারা তখনো ছিল গৃহবন্দী হয়ে, তারাও ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। গরমে মথুরগঞ্জে দিয়ে আসবে ভেবেছিল সুশান্ত। মা বাবার কাছে আম-কাটালের ছুটি কাটিয়ে আসুক। কিন্তু চারদিক যেমন অশান্ত হয়ে উঠেছিল, বহ্নিশিখা ছাড়তে চাইল না মেয়েকে। পুজোয় যাবি মা। আমরাও যাব। দিয়ে আসব। আবার পুজোর পর নিয়ে আসব। বহ্নিশিখার মনে হচ্ছিল অশান্তিটা কমুক। কিন্তু কমছিল না। সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে সব। পুজোর সময় সবদিক শান্ত ছিল। তারা মহালয়ার পর চলল মেয়েকে নিয়ে। বহ্নিলতার মা বাবার জন্য শাড়ি পাঞ্জাবি, পায়জামা কিনল, নিতাইহরি আর যমুনাবুড়ির জন্য ধুতি আর শাড়ি। গেল বহ্নিশিখা আর সুশান্ত। সুশান্ত তো আগে গিয়েছিল। বহ্নিশিখা যায়নি কখনো সুন্দরবনে। টাকি হাসনাবাদ যাওয়া আর সুন্দরবনের অন্তঃস্থলে যাওয়া এক নয়। সেই হাসনাবাদে ডাঁসা নদী পার হয়ে ওপার থেকে ট্রেকার চাপল সকলে। নদী যে ইছামতি নয় তা বলল বিশ্বনাথ গায়েন। হ্যাঁ, বিশ্বনাথ গায়েন তাদের সঙ্গী হয়েছিল হাসনাবাদ থেকে। টাকিতে ইছামতি, সেই নদীর ওপারে বাংলাদেশ। শুনে বহ্নিলতা বলল, তাদের দেশ ছিল, ঠাকুমার কপোতাক্ষ আর ঠাকুদার বেতনা। বিশ্বনাথের কথা তিনজনই মন দিয়ে শুনছে। বহ্নিলতাও ভাল চেনে না এখনো এই পথ। চিনবে বড় হতে হতে। সেই কতদিন বাদে বহ্নিলতা

ফিরছে বাড়ি। মায়ের কাছে, বাবার কাছে, ঠাকুমা ঠাকুদার কাছে। নিতাইহরি এখনো কোমর সোজা করে হাঁটতে পারে। চোখ কাটিয়েছে গেল সনে। যমুনাবুড়ি বসে বসে নিজের মনে ছড়া কাটে, নাতনিটা শুনত, এখন শোনার কেউ নেই। শুনে মনে রাখার কেউ নেই। বিশ্বনাথই বলছে সব। মাসে মাসে একটা টাকা দেয় সুশান্ত বহ্নিলতার বাবাকে। বিশ্বনাথ দিয়ে আসে। মানি অর্ডার করলে সে টাকা মেরে দেবে পোস্ট মাস্টার। প্রাক্তন বিপ্লবী বিশ্বনাথের কাজ এখন এই। মানুষের পাশে দাঁড়ানোও তো বিপ্লবীর কাজ। মনে মনে তাই জানে প্রাইমারি টিচার বিশ্বনাথ। হ্যাঁ, পোস্ট অফিসে এসে গেলেও সে টাকা বিলি হয় না। এমনি হয়েই থাকে। সুন্দরবনের কত পুরুষ বাইরে গেছে কাজ করতে। তাদের পাঠানো টাকা কখনো প্রাপক পায়, কখনো তা দিকহারা গাঙের পানিতে হারিয়ে যায়। ডাঁসা নদী পার হয়ে ট্রেকার যাত্রায় বিশ্বনাথের কাছে বহ্নিলতা কেন সুশান্ত বহ্নিশিখাও চিনে নিতে থাকে তাদের যাত্রাপথ। পথ চিনে নিতে থাকে তিনজনে। বিশ্বনাথ গায়েন বলে, এই যে বামদিকে যে গ্রাম, রামেশ্বরপুর নাম। এই পুরের ঘোষেরা সব কলকাতার বেলগাছিয়া থাকে। তারা আসে মাঝেসাঝে। ইদানীং পার হতে খুব দেখি না। রাস্তার দুপারে সজল সবুজ বৃক্ষেরা পথের উপর ছায়া মেলে আছে। আচমকা তারা উধাও হয়ে যায়। দুধারেই মাঠ আর মাঠ। মাঠ পার হয়ে ইছামতি আছে। ইছামতির ওপারে বাংলাদেশ। এই যে আমরা যাচ্ছি, এ তো এক দ্বীপ। এই গ্রামের নাম বরুনহাট। বড় গঞ্জ। তারা দেখল দোকানপাট, ঘরবাড়ি, মানুষজন, বেচাকেনা। ভ্যান রিকশা ডাকছে প্যাসেঞ্জারদের, কাটাখালি, কাটাখালি। কাটাখালিতে এখন ব্রিজ হয়েছে। বিশ্বনাথ গায়েন বলে যাচ্ছিল। এই নদীর নাম গৌড়েশ্বর। আসলে ইছামতিকে রায়মঙ্গল নদীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল এই খাল কেটে। ইছামতির ওই ওপার দেখা যাচ্ছে। ওপারে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলা। পার হলেই অন্য দেশ। শুনতে শুনতে বহ্নিলতা বলল, আমাদের দেশ ছিল গো মা, বেতনা বলে এক নদী আছে ওপারে, তার ধারে যুগীপোতা গ্রাম।

বিশ্বনাথ গায়েন বলছিল, প্লাবনে প্লাবনে সেই কাটাখাল হয়ে গেছে গৌড়েশ্বর নদী। ট্রেকার চলছে। এরপর যে গঞ্জ এল, তা স্যান্ডেলের বিল। বিলিতি এক স্যান্ডেল সায়েব জঙ্গল হাসিল করে এখেনে জমিদারি পত্তন করেন। তাঁর নামেই নাম। এরপর হেঙ্কেলসায়েবের গঞ্জ, হিঙ্গলগঞ্জ। ১৭৮১ সালে যশোহরের জেলা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন টিলম্যান হেঙ্কেল। তিনিই সুন্দরবনের বাদাবন কেটে এই এলাকার পত্তন করেন। জল-জঙ্গল সরিয়ে বেরোয় উর্বর কৃষিজমি। হেঙ্কেল সাহেব ইছামতীর ধারে প্রতিষ্ঠা করেন 'হেঙ্কেলগঞ্জ বাজার'। সেই 'হেঙ্কেলগঞ্জ'ই ধীরে ধীরে 'হিঙ্গলগঞ্জ' হয়ে যায়। মুগ্ধ হয়ে তিনজন শুনছিল বিশ্বনাথ গায়েনের কথা। আকাশ নির্মল। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। তারা সুন্দরবনের দূর গভীরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ।

এগার

ট্রেকার থেমেছে। লেবুখালি ঘাট। এখান থেকে ভুটভুটি নৌকোয় চেপে সুন্দরবনের অন্তঃস্থলে যেতে হয়। তারা যাবে। লেবুখালি ঘাটে নৌকো প্যাসেঞ্জার হাঁকছে, ভাণ্ডারখালি, দুলদুলি......। লেবুখালিতে কালিন্দী আর গৌড়েশ্বর মিশেছে রায়মঙ্গল নদীর সঙ্গে। রায়মঙ্গল নদীর গায়ে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা হবে। কালিগঞ্জেই ইছামতি থেকে রায়মঙ্গলের জন্ম। ইছামতি আরো নদীর জন্ম দিয়েছে এদিকে। বিদ্যাধরী,, ঝিলা, কালিন্দী এবং যমুনা নদী। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম দিকে বসন্তপুরে ইছামতি থেকে জন্ম নেওয়া যমুনা থেকে কালিন্দীর জন্ম। রাজা প্রতাপাদিত্যের সময় এই শাখা সাধারণ খালের মতো ছিল। পরে প্লাবনে কালিন্দী বড় নদীতে পরিণত হয়। বড় গাঙ। দেখলে ভয় করে। অন্তহীন জল আর জল। বিশ্বনাথ গায়েনের সব জানা। সুন্দরবনের মানুষ আর মাটির ইতিহাস লিখছে বিশ্বনাথ। এখন তারা ভুটভুটি চালিত বড় নৌকোয় বড় গাঙে ভেসেছে। গঞ্জের মানুষ তাদের সাথী। তারা কতরকম কথা বলছে। ধানের কথা, জমির কথা, বাঘের কথা, কলকাতার কথা। নন্দীগ্রামের কথাও তাদের জানা। কে যেন তুলল। আর একজন থামিয়ে দিল। কে কী বুঝবে কে জানে। সময় ভালো না। নৌকো এসে যে ঘাটে ভিড়ল, সেই ঘাট ভান্ডারখালি। ভান্ডারখালিতে কিছু লোক নামে, কিছু ওঠে। তারা যাবে দুলদুলি। দুলদুলিতেই জলযাত্রা শেষ। এরপর দিকহারা গাঙ দক্ষিণে গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। দুলদুলিতে নেমে মেয়ের মুখ যেন আলোয় ঝলমল করতে লাগল। বলল, এবার আবার ট্রেকার, মথুরগঞ্জ, এইটা আমি জানি।

এই দ্বীপ শেষ দ্বীপ যেখানে মানুষ বসত করে। বিশ্বনাথ গায়েন বলে, ১৫ কিলোমিটার মথুরগঞ্জ, তারপর আরো যদি যাওয়া যায় কালিতলা, তারপর সামসেরগঞ্জ। সামসেরগঞ্জের পরেই জঙ্গল আরম্ভ হয়ে গেল। ঝিঙেখালির গাঙের পর বাঘের দেশ। গাঙটা খুব ছোট। বাঘ এসে পড়ে জঙ্গলের জাল টপকে।

হ্যাঁ মা, বাঘে তো গরু-ছাগল নিতি ঢুকে পড়ে মাঝে-মধ্যে, আমাদের বাঘের দেশ। বলল বহ্নিলতা।

শুনতে শুনতে বহ্নিশিখা ভাবছিল, সে এই দেশটার কিছুই জানে না। কতদূরে মানুষ বসবাস করে। তাদের শহর নেই, আলোর ঝলকানি নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই, শুধু গাঙ পারাপার আছে। মথুরগঞ্জে নেমে এগোতে যাবে চারজন, তো একটি বছর ষোল-সতেরর যুবক এসে দাঁড়াল বহ্নিলতার সামনে, লতু এলি, কত বড় হয়ে গিলি তুই।

রবিদা, তুমি কত লম্বা হই গেছ, মা, এ হলো রবিদা, রবিদার বুন মৌমিতা আমার সঙ্গে পড়ত, ইস্কুল আবার চালু হয়েছে রবিদা ?

রবি বলল, বন্ধ হয়ে থাকবে নাকি, গ্রামে কি লেখাপড়া হয় না, তার জন্যি কলকাতা যেতি হয় ?

সুশান্ত দেখল ময়লা ময়লা রঙের ছেলেটির চোখ ঘুরছে সকলের উপর। সে এবার সুশান্তকে বলল, আপনারা এয়েচেন, একবার পার্টি অফিস হয়ে যাবেন।

কেন? বহ্নিলতা জিজ্ঞেস করে।

আমার কাকা ডাকতেছেন, উনি পঞ্চাত সমিতির সভাপতি, কাকা আমারে পাঠাল।

এখন যেতে হবে?

কাজ মিটায়ে যান, ফেরবেন তো আজই?

হ্যাঁ, ফিরব। বলল বিশ্বনাথ গায়েন।

নামটা মনে আছে সুশান্তর। পরিতোষ মন্ডল। সে লতা আর বহ্নিকে যেতে বলল, কাছেই তো বাড়ি। বিশ্বনাথকে নিয়ে পার্টি অফিসে গেল। আগেরবার ২০০ টাকা নিয়েছিল, এবার কত নেয় কে জানে? এখানে একটা ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কের বেলঘরিয়া শাখায় সুশান্তর অ্যাকাউন্ট। প্রয়োজনে চেক দিয়ে যাবে সে। রবি আগে আগে হাঁটতে লাগল। বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করল, রবি তুমি কী করো?

ইলেবেনে পড়ি হাই ইস্কুলে। রবি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল।

সায়েন্স না আর্টস ?

রবি বলল, আর্টস, কেন?

বিশ্বনাথ বলল, এমনি, আচ্ছা তুমিও পার্টি করো ?

ইয়েস, সর্বহারার পার্টি আমাদের, কেন ? রবির চোখে সন্দেহ।

বিশ্বনাথ বলল, না, এমনি জিজ্ঞেস করছি, রবি তুমি কলকাতায় গেছ ?

কতবার গিইছি, পার্টির পোগগাম হলেই যাই, কেন ?

জবাব দেয় না বিশ্বনাথ। তারা পার্টি অফিসে এসে গেছে। বড় দোতলা পাকা বিল্ডিং। আগেরবার একতলা দেখেছিল তারা। দোতলায় উঠে গেল তারা। দোতলায় যে ঘরে তাদের নিয়ে গেল রবি, সেই ঘরের জানালা থেকে মথুরগঞ্জের ট্রেকার স্ট্যান্ড, রাস্তা ভালো দেখা যায়। কে এল, কে গেল, কে এল না, কে গেল না ধরা যায়। পরিতোষ মন্ডল বছর পঁয়তাল্লিশ হবেন। মোটা গোঁফ, কালো কুচকুচে। মাথার চুল কাঁচায় পাকায়। মুখখানি গোলাকার। চোখদুটি বড়, পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি সব কিছু দেখতে পছন্দ করেন। অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে তা সমুখের মানুষের কাছে। গোলাকার মেদবহুল দেহ। মাথায় পাখা ঘুরছিল। মথুরগঞ্জে জেনারেটর চালিয়ে সন্ধে থেকে রাত দশটা অবধি আলো জ্বালান হয়। আর পার্টি অফিসের নিজস্ব জেনারেটর আছে। তার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সুশান্ত , বিশ্বনাথ। ওরা বসল সভাপতির টেবিলের সামনের দুই চেয়ারে। তিনি বললেন, আপনাদের না ডাকা করলে তো আসতেননি, বসেন, মেয়েডা কই?

বাড়ি গেল। বিশ্বনাথ জবাব দেয়।

পুজোর ছুটিতে এল?

হ্যাঁ, আপনি ভালো আছেন? সুশান্ত জিজ্ঞেস করে।

তিনি চুপ। কী যেন ভাবছিলেন। মনে করতে পারছিলেন না। নাকি কী ভাবে বলবেন তা ঠিক করে নিচ্ছিলেন, তারপর গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, মেয়েডারে নিয়েই নিলেন?

নিয়ে নিইনি তো, লেখাপড়া শেখাচ্ছি। বলল সুশান্ত।

গাঁয়ে শিখত লেখাপড়া, আপনারা না হয় খর্চা দেতেন। বললেন পরিতোষ। চুপ করে থাকলেন কিছু সময়, তারপর বললেন, আসলে আমাদের নজরে থাকত তো, এক জা'গার গাছ অন্য জা'গায় পুতলি কি ভাল হয়, না বাঁচে।

সুশান্ত সতর্ক হলো, লতাকে কি আটকে দেবে, পুজোর পর নিয়ে যেতে দেবে না, সে খুব বিনীত সুরে বলল, আপনি আসুন না আমার বাড়ি, বেলঘরিয়ায়।

ঠিকানা রেখে যান, আচ্ছা কলকাতার কী অবস্থা ?

ভালোই তো। বলল বিশ্বনাথ।

পরিতোষ মন্ডল ভোল বদল করে বললেন, আপনারা অবিশ্যি ভালোই করেছেন, মেয়েটা ভালো ইস্কুলে পড়ছে, আমাদের এখেনে সব সুবিধে নেই, কিন্তু সবাইরে তো নে যেতি পারবেন না, কেউ পাবে কেউ পাবে না সুযোগ।

সুশান্ত, বিশ্বনাথ চুপ করে থাকে। সমস্ত জীবন যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা, মিছিল, আত্মগোপন, জেলখানা, মিছিল করে আসা সুশান্ত উদ্বিগ্ন হলো। তার কেন যে গা ছমছম করে উঠল।

দুপুরে ভাত খাবেন কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন পরিতোষ।

সে হবেখন। বিশ্বনাথ গায়েন বলল।

না না, আমার বাড়ি গে বসেন, ওখেনেই খাবেন, আপনারা অতিথি বটে। পরিতোষ মন্ডলের মেজাজ আচমকা বদল হয়ে গেল। তিনি বললেন, রবি ওঁদের নে যা, আমাদের ওখেনে খাবেন ওঁরা।

সুশান্ত বলল, ধন্যবাদ, কিন্তু আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমরা লতার বাড়ি যাই আগে।

দরকার নেই, আগেরবার তো গিইছিলেন, ওদের খবর দিচ্ছি, সব আমার বাড়িতি এসে দেখা করবে, মেয়েডারে নেছেন বলে ওই রিফিউজি বাড়িতি খেতি হবে নাকি?

সুশান্ত বলল, না, আসলে...। কথা থামিয়ে দেয় সুশান্ত। লোকটা তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটি ঈষৎ লাল হয়ে উঠে জ্বলছে। পরিতোষ মন্ডল ঘাড় ঘুরিয়ে ভাইপোকে বললেন, আর যিনি আছেন ম্যাডাম, তাঁরে নে আসবি রবি।

আহা, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমরা দুপুরের রুটি, তরকারি, মিষ্টি, ফল সঙ্গে নিয়েই এসেছি, অবেলায় পৌঁছলে অসুবিধে হবে বলে। মিথ্যে করেই বলল বিশ্বনাথ। কিন্তু সুবিধে হলো না। এই দ্বীপে পরিতোষ মন্ডলের কথা আদেশই। তা কেউ অমান্য করার কথা ভাবতেই পারে না। চোখ দুটি যেন দপদপ করছে। পরিতোষ মন্ডল লোক পাঠিয়ে বাড়িতে খবর দিয়েছেন এর ভিতরেই। তিনি বললেন, ওই লতুর মা আমার বাড়িতেই দাসী, রবি তুই কাউরে দিয়ে খপর দে, লতুর মা পুষ্প যেন চলে আসে, থালা-বাসন ধুয়াধুয়ি আছে, আর লতুরেও বলিস খেতি আসতে।

কী অদ্ভুত হয়ে গেল। কিছু করার উপায় থাকল না। পরিতোষ মন্ডলের কথা এই দ্বীপভূমিতে চূড়ান্ত। তাঁকে অমান্য করবে কে? আপত্তি করতে পারে না সুশান্ত, তার ভয় হচ্ছিল যদি লতাকে আটকে দেয় পুজোর পর। পরিতোষের একটিই কথা, তাঁর বাড়িতে খেয়ে রওনা হবেন অতিথিরা। যাওয়ার সময় লতুর বাড়ি না হয় ঘুরে যাবেন। মথুরগঞ্জে বিশিষ্ট কেউ এলে, তাঁর বাড়িতেই অন্ন গ্রহন করেন। সবাই তা জানে। লতুর বাপ-মাও জানে। বলেনি কেন লতু?

তাইই হলো। ভ্যান রিকশায় চেপে তারা চলল পরিতোষ মন্ডলের বাড়ি। বাড়ি তো নয়, দুর্গ। মাটির প্রাচীরে ঘেরা। প্রবেশ পথে ইট গাঁথনির দুই পিলারে লাগানো বেশ জাব্দা শালকাঠের দরজা। একটু নিচু হয়ে ঢুকতে হয়। মোটর সাইকেলে আগেই এসে গেছেন পরিতোষ। স্বাগত জানালেন। বললেন, বাংলাদেশি ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পেতে এই ব্যবস্থা। বিশ্বনাথ এবং সুশান্ত প্রবেশ করল মাথা নামিয়ে। ভিতরে অতি প্রশস্ত উঠন। উঠনের এক ধারে ধান সেদ্ধ হচ্ছে। পরপর তিনটি উচু পোতার ভিটা। ইটের গাথনির একটা, ঢালাই ছাদ। শীর্ণকায় কামিন একজন বসে আছে সেখানে। চুলোয় আগুন লকলক করেছে। কাঠই জ্বালানি। একজন কুড়োলে চেরাই করছে মস্ত এক কাঁটালের গুড়ি। চেরাই কাঠ উঠনে স্তূপ হচ্ছে। আবার রৌদ্রে শুকোচ্ছে বিছিয়ে দেওয়া কাঠও। পরিতোষ হাকডাক আরম্ভ করল, অতিথ এসে গেছে, কলকাতার অতিথ। এই গুলু, হাত্মুখ ধুবার জল নে আয়।

বালতিভরা জল এল। একটি ভৃত্য নিয়ে এল। তারা মুখ ধুয়ে পাকা বাড়ির বারান্দায় চেয়ারে বসে। চিনি কাগজি লেবুর শরবত এল। কে যেন দরজা দিয়ে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল, ভৃত্য তা নিয়ে এল। তারা দেখতে লাগল ধান সেদ্ধ, কাঠ চেরাই, কাঠ শুকানো আর ত্রস্ত দাস-দাসীদের চলাফেরা । সুশান্ত ফোন পায় বহ্নিশিখার, এ কী ব্যাপার, তোমরা কোথায় বসে আছ ?

পরে কথা হবে, এস এখানে। সুশান্ত চাপা গলায় বলল।

কেন, তোমরা এখেনে আসবে না ?

সুশান্ত বলল, পরে বলব, আগে এস। ফোন কেটে দিল সে।

একটু পরে ক্রুদ্ধ বহ্নিশিখা ঢুকল। সে একা। ঢুকতে ঢুকতে বলল, ওরা ডাল ভাত চাপিয়েছিল।

পরিতোষ মন্ডল বলল, সে ওরা খেয়ে নেবে ম্যাডাম, আপনি আমাদের মথুরগঞ্জ আইল্যান্ডে গেস্ট, আর এখেনে যাঁরা আসেন, আমার ঘরে অন্ন গ্রহণ করতেই হয়, জ্যোতি বসু পর্যন্ত এয়েছেন এখেনে।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে লতা কই ?

হেঁটে আসছে ওর মাকে নিয়ে, এইটা কি ঠিক হলো ?

ঠিকই হয়েছে ম্যাডাম। পরিতোষ মন্ডল তার কথার পিঠে কথা বলল। বহ্নিশিখা আচমকা চুপ করে যায়। এতক্ষণে সে হয়তো উপলব্ধি করছিল বাস্তব। পরিতোষ মন্ডল অন্তঃপুরে গেল। এ বাড়ির মেয়েদের দেখা যাচ্ছে না। একবার মাথা ভর্তি ঘোমটা কে বাইরে এসে ভিতরে ঢুকে গেল। সুশান্ত বহ্নিশিখাকে বলল, লতা কি আজ যাবে আমাদের সঙ্গে?

কেন, ও তো বিজয়ার পর যাবে, এখেনে দশমীর মেলা বসে। বহ্নিশিখা বলল।

মা বাবাকে তো দেখে গেল! সুশান্ত বলে।

কী হয়েছে ? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

তখন বিশ্বনাথ গায়েন বলল, তুমি যা ভাবছ তা হবে না সুশান্ত, দশমীর পরের দিন আমি এসে নিয়ে যাব, এখন এদের পার্টি নানা ব্যাপারে জর্জরিত, ফালতু ঝামেলা পাকাবে না।

সুশান্ত বলল, লোকটাকে আমার সুন্দরবনের বাঘ মনে হচ্ছিল।

বিশ্বনাথ গায়েন বলল, পার্টি বিপদে আছে, এখেনে পাল্টা পারটিও মাথা তুলছে, তোমার চিন্তা নেই।

তখন লতা আর তার মা পুষ্পরানি ঢুকল ভিতরে। পুষ্পরানির মাথা ঢাকা অনেকটা ঘোমটায়। সে দ্রুত পায়ে ভিতরে ঢুকে গেল একটি কথাও না বলে। লতাও মায়ের পিছু পিছু গেল, বলল, জেঠির সঙ্গে দেখা করে আসি।

বারো

লতা কলকাতায় ফিরে বলল, হ্যাঁ, উনি অমন, ওর কথাই মথুরগঞ্জে শেষ কথা। তারা যদি সেদিন না খেয়ে চলে আসত, বিপদ হতো, রাগ পড়ত রিফিউজির উপর, উনি তার বাবাকে রিফিউজির ছাওয়াল বলে ডাকেন, ঠাকুদ্দাকে রিফিউজি বুড়ো, খাওয়া হয়েছে ভাল হয়েছে ।

তারা ফেরার সময় লতাদের বাড়ি হয়ে এসেছিল। দুই পুরুষ বসেছিল, একজন হাতনেতে আর একজন উঠনে নিম গাছের গোড়ায় ছোট চৌকিতে। বুড়ি ঠাকমা যমুনা হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আকাশে। বুড়ো রিফিউজি নিতাইহরি জাল বুনছিল নিজ মনে। তারা সকলেই অপেক্ষা করছিল মেয়ে আর তার মায়ের জন্য। মেয়ের মা আসেনি। বাসন মেজে সব পরিষ্কার করে ফিরবে। বলাইহরি উঠে এসে বলেছিল, আর একবার এস মা, ভাত খেয়ে যেও।

হ্যাঁ, আসব, তোমরা যেও কলকাতায়। বহ্নিশিখা বলল।

আশী পার করা রিফিউজি বুড়ো বলেছিল, আমি পারব না, মনে হয় এখেন থেকে বেরুলিই যেন সেই দন্ডকারণ্য ফিরি যেতি হবে, ওই মন্ডলের পো আর ঢুকতি দেবে না।

মন্ডল তাই বলেছে ? সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছিল।

বুড়ো মাথা নেড়েছিল, না, বলে নাই, কিন্তু মনে সেই ভয় হয়, এখনো দুঃস্বপ্ন দেখি।

কিসের দুঃস্বপ্ন? সুশান্ত তার সমুখে হাঁটু মুড়ে বসেছিল।

মরিচঝাঁপিতি পুলিশের মার। বলে বুড়ো মাথা নিচু করে, বিড়বিড় করে, আবার সেই মরুভূমি, নরক, জল নাই, বিষ্টি নাই, আমি এই ভিটে ছেড়ে যাবনি।

কলকাতা থেকে ফিরে আসবে তো আবার। বলেছিল সুশান্ত।

ফিরে এসে দেখব ভিটা নাই। বুড়ো বলেছিল, এই রকম হয়, হয়েছে কতবার।

বুড়ি বলে, মেয়েডা ভালো থাকুক, ভগমান তুমাদের ভালো করুক।

বলাইহরি এগিয়ে এসে বলেছিল, বাবা না গেলি তো লতুর মা যেতি পারবেনি, আমি যাব মেয়েরে নিয়ে।

বুড়ি বলেছিল, তোর আবার বেশি বেশি, আমি কি রান্না করে খাওয়াতি পারব না?

তুমি চলতি ফিরতি পার না, কী ঘটাই বসবা মা, কী করে তুমাদের রেখে যাব।

বুড়ি বলে, আমি আর তোর বাপ না হয় চিড়ামুড়ি খেয়ে ক'দিন কাটাই দেব, উনুনে আগুন দেব না।

তা হয় নাকি মা ! বলাইহরি বলে, ভাত ছাড়া বাবা থাকতি পারে না।

খুব পারবে, এক কাঁদি সবরি কলা আর চিড়া গুড়, এতিই হবে। বুড়ি বলে, গুনগুন করে,

চিড়া গুড় সবরি কলা
তাই দি যায় তিন বেলা।
লেবু পাতা লেবু পাতা
আর চাইনে মাছের মাথা।

নাতনি বহ্নিলতা বলেছিল, ওই তুমি আরম্ভ করলে,

ভাত খাবা না চিড়া মুড়ি
তুমি একটা আচ্ছা বুড়ি।
বুড়ি আমার ঠাম্মা বুড়ি
দেয় দেখ দেখি বুড়বুড়ি।
যেমন দেয় মাছের দলে
সাত মানুষের গহীন জলে।

বহ্নিশিখা কেন তারা সবাই অবাক, আরে তুই দেখি ছড়া বলিস।
বুড়ি ঠাকমা বলেছিল, নাতিনি আমার এমনি এমনি,
ডয়রা কলা সেদ্ধ
আমরা দুই বেদ্ধ
মরব কবে ঠিক নাই
যুগীপোতার ঠিকানাই।

লতার মা ফিরে এসেছিল। তার মন খুব খারাপ। ভাত খাওয়াতে পারেনি। দেখা করতে এসেছে, আবার বাবুর বাড়ি যেতে হবে, বাসনের পাঁজা, উঠন ঝেটাতে হবে, কাজ শেষ হয়নি।

তারা আর দাঁড়ায়নি। একছড়া সবরি কলা দিয়েছিল লতার মা পুষ্প। আর কী দেবে? আছে কী? বহ্নিশিখা বলেছিল, লক্ষ্মীপুজোর পরই চলে আসতে।

বলাইহরি বলেছিল, সে দিয়ে আসবে।

কিন্তু লতাকে নিয়ে এসেছিল বিশ্বনাথ গায়েন। বলাই আসেনি। না, আনতে কোনো অসুবিধে হয়নি। আর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরিতোষ মন্ডল তখন ছিলেন না মথুরগঞ্জ দ্বীপে। ছোট মোল্লাখালি গিয়েছিলেন কুটুমবাড়িতে। নিশ্চিন্তে আনতে পেরেছিল বিশ্বনাথ। লোকটা তার দাপট দেখাতে হয়তো বলতে পারত আর ক'দিন বাদে নিয়ে যেতে। লোকটা অন্যদের বিব্রত করতে ভালবাসে। মথুরগঞ্জের শাসক সে, তা প্রতিপদে প্রমাণ করতে চায়। ক্ষমতা প্রকাশের প্রধান লক্ষণ হলো দুর্বলকে বিব্রত করা।

লতা এসেছিল লক্ষ্মীপুজোর পর। তখন শহর মফস্বল ছিল শান্ত। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে চাপানউতোর চলছিল। তর্ক বিতর্ক চলছিল। গুটি গুটি হেমন্ত এল শহরে। হিম হিম ভাব আসে রাতের দিকে। মেয়ে তার মা বহ্নিশিখার সঙ্গে গল্প করে কত। সুশান্ত থাকে শ্রোতা। মেয়ে বলে, তাদের মথুরগঞ্জে খেজুর গাছ কাটা শুরু হলো। তার বাবা বলাইহরি গাছ জমা নেয়, সভাপতির গাছ ফ্রিতে করতে হয়।

হুঁ। বহ্নিশিখা বিড়বিড় করে, কিছুই বদলায়নি দেশটার, আমরা ঘর ছেড়েছিলাম কেন, কেন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলাম, জেল খেটেছিলামই বা কেন?

মেয়ে বলে, খেজুর পাটালি খুব ভাল হয় মথুরগঞ্জে, মা এখন ধান পেকেছে, এই সময়টা খুব ভাল।

মেয়ে বলে, বাবা বলেছে এবার ঝড়-বাদল হয়নি তেমন, ধান ভাল হয়েছে।

মেয়ে বলে, এ সময় লোকের ঘরে অভাব থাকেনি, পিঠে পুলি হয়, মা ঠাকমা করে কত রাত জেগে, রসের পিঠে, দুধ থাকে না, কিন্তু তার স্বোয়াদ কত।

মেয়ে গুনগুন করে তাদের সংসারের কথা বলে। ছয় ঋতুর কথা বলে। ছয় ঋতুতে কেমন থাকে তারা সেই কথা শোনায়। বারমাস্যা।

বৈশেখে ভীষণ কষ্ট
চাল বাড়ন্ত হয়
বর্ষায় ধান রোয়া
ভীষণ সাপের ভয়।

ফুটা চালে জল পড়ে
গাঙে তুফান হয়
বড় গাঙ উঠে আসে
জমি নুনা হয়।
শরতে ঝড় বাদলা
ফুরায় ধীরে ধীরে
কালো মেঘ তিতা মেঘ
যাও ঘরে ফিরে।

শুনতে শুনতে বহ্নিশিখা জড়িয়ে ধরে মেয়েকে, কে বলেরে এমন বারমাস্যা?

বহ্নিলতা বলে, বোধ হয় আমার ঠাকমা যমুনাবুড়ি বলে।

যমুনাবুড়ি আর কী বলে?

হাসে বহ্নিলতা, জিজ্ঞেস করে, মা তুমার ভালো লাগতেছে?

হ্যাঁরে মেয়ে হ্যাঁ।

কিন্তু সেই লোক খুব রেগে গিয়েছিল পেত্থমটা শুনেই। বহ্নিলতা বলে।

কোন লোক ? সুশান্ত জিজ্ঞেস করে।

যার বাড়ি তোমরা খেয়েছিলে, মোড়লের পো।

কেন তার রাগের কারণ কী ? সুশান্ত জানতে চায়।

বোশেখে ভীষণ কষ্ট, চাল বাড়ন্ত হয়, কেন রেশনে কি চাল গম দেয় না, পঞ্চায়েত কি দ্যাখে না? বলতে বলতে হি হি করে হাসে বহ্নিলতা, তারপর রেশনে এক হপ্তায় চাল বন্ধ করে দিল, ঠাকমা আর বারমাস্যা বলা বন্ধ করে দিল, বরং বলল,

বৈশেখে খুব সুখ
হরির নাম হয়
ক্ষুধা তেষ্টা হরিনামে
হইল বিলয়।

বহ্নিশিখা বলল, তোর দেখি সব মুখস্ত।

যমুনাবুড়ির নাতনি আমি, হ্যাঁ মা, আমার আপনাআপনি মনে এসে যায়।

হেমন্তের বেলা যায়
কুয়াশায় ঢাকে
শীতবুড়ি উয়ার ভিতর
নিজ দেহ রাখে।
ফাগুনে আমের বোল
চৈতে বিল্বফল
শিবঠাকুর শিবঠাকুর
মাথায় নিও জল।

তোর বাবা সব সিজিনের কাজ পারে? সুশান্ত প্রসঙ্গ বদল করে।

সব সিজিনের মানে? বহ্নিলতা জিজ্ঞেস করে।

এই মাছ ধরা, ধান চাষ, খেজুরগাছ কাটা, গুড় জ্বাল----সব কাজ?

মেয়ে বলে, কিছু পারে, কিছু ভাল পারে না।

বহ্নিশিখা বলে, শীতে একবার যাব, ঘুরতে যাব।

শীতে কতলোক যায়, লঞ্চে গাঙে ঘুরে বেড়ায়, বাঘ দেখতি যায়, মা, বাঘ দেখে কী হয়?

তা বটে। বাঘ দেখে কী হয়? কী হয় তা যে দেখেছে সে বলতে পারবে। বহ্নিশিখা বলে, সে বাঘ দেখেছে অল্প বয়সে, গাঁয়ের মুরুব্বি। চোখ দেখে বাঘ চেনা যায়। চোখ রাঙিয়ে বলেছিল, এক্ষুণি বিদায় হও, না হলি তুমার ইজ্জত নেবে আমার ছেলেরা। আর বাঘ দেখেছিল থানায়। ধরা পড়ে যাওয়ার পর। জেরার সময় সেই অফিসার নন্দকুমার মুখুজ্জে বলেছিল, যা জিজ্ঞেস করা হবে, উত্তর না দিলে পাঁচটা লোক দিয়ে রেপ করা হবে, বল, বিমান মাহাতো কোথায় ?

শুনতে শুনতে বহ্নিলতা বলেছিল, সে তো বনের বাঘ না মা, বনের বাঘ অমন করে না।

তাহলে কী করে ? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করেছিল।

খিদে পেলে তবে বন থেকে বের হয়, নইলি সে ফিরেও তাকায় না।

তুই এসব জানলি কোথা থেকে ?

যমুনাবুড়ি বলে যে। বহ্নিলতা শোনায়। শোনায় বহ্নিলতা। বারমাস্যা শোনায়। শোনাতে শোনাতে থামে। হেমন্তের রাতে গাঁ উজাড় হয়ে গেছে। কত মানুষ মারা গেছে। লাশ ভেসে গেছে হলদি নদীর জলে। নন্দীগ্রামে সূর্যোদয় হয়েছে। মানুষ অবরোধ করে রেখেছিল কেমিক্যাল হাবে জমি দেবে না বলে। অবরোধ ভেঙেছে শীতের রাতে। আবার মিছিল। এই মিছিলে না গেলেই নয়। মা আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।

তের

দু বছর আগের কথা শুনছে অতনু আর কুন্তলা। শুনলে অতনু, মেয়ে আমাদের এমন। বলল সুশান্ত। নন্দীগ্রাম যখন মুক্ত হয়, সূর্যোদয় হয় যখন নন্দীগ্রামে, সেই হেমন্তদিনে অতনুরা চলে গিয়েছিল দেশ ভ্রমণে। বহুবার ঘোরা সেই মধ্যভারতে বেরিয়ে পড়েছিল। চিত্রকূট পাহাড়, বিন্ধ্য পর্বত, নর্মদার উৎস, পাঁচমারি পাহাড়……, তারা জানতই না কী হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। আবার জানত না কি, খুব জানত। হোটেলে বসে টেলিভিশন কি দ্যাখেনি? এখন কি কোনো খবর চাপা থাকে? সিনেমা উৎসবের সূচনায় যখন মত্ত কলকাতা, সেই রাতে নন্দীগ্রামে সূর্যোদয় ঘটে। তারপর ১৪-ই নভেম্বর সেই মহামিছিল। সেই মহামিছিল দেখেছিল অতনু টেলিভিশনে। তাদের মেয়ে ফোন করেছিল মোবাইলে। সে ছিল উদ্বিগ্ন, মা, বাবা, তোমরা কেমন আছ?

অতনুর সব মনে আছে। তাদের কী হবে, তারা তো শহরেই নেই। ভাগ্যিস নেই। মেয়ে বলেছিল, মা, তোমরা চলে এস, ছ'মাস কাটিয়ে যাও এখানে, ওয়েস্ট বেঙ্গল এখন নিরাপদ নয়।

তারা পরদিন গিয়েছিল ভীম বৈঠকা। গুহাচিত্র দেখেছিল। সেখান থেকে ভূপাল হয়ে সাঁচি স্তূপ গেল দুদিন পরে। তখন কলকাতা ফুটছে। মনে হয়েছিল খুব বেঁচে গেছে। ঘর থেকে বেরতে পারত না। বেরলে কথা বলতে পারত না। নন্দীগ্রাম কোথায় তার খোঁজই রাখে না। সিঙ্গুর ছিল হাইওয়ের ধারে, দেখেছে গাড়ি নিয়ে শান্তিনিকেতনের দিকে যেতে। ইস, গাড়ির কারখানা হতে গিয়ে কী বিপত্তি।

চিত্রকূটের নাম শুনে বহ্নিলতা বলেছে, ওইদিকেই তো দন্ডকারণ্য।

অতনু জানে না তা নয়, তবে দন্ডকারণ্য দেখতে যায়নি তো সে। আর এখন ছত্তিশগড়ে খুব মাওবাদি ধরপাকড় চলছে। আদিবাসী গ্রামগুলো তছনছ করে দিচ্ছে সালোয়া জুডুম নামে সরকার পোষিত সংগঠন।মাওবাদি সন্দেহে আগে ঘরবাড়ি, পরে গ্রামই জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সালোয়া জুডুম তুলে নিয়ে গিয়ে নিখোঁজ করে দিচ্ছে জোয়ান পুরুষ থেকে মেয়েদেরও। বহ্নিলতা বলছে, সে জানে সব। নেট সার্চ করতে শিখেছে। মেসো, তোমরা সেই জন্য ছত্তিশগড় যাওনি, মেসো আদিবাসীদের উচ্ছেদ করছে ভিটেমাটি থেকে, মাটির নিচে খনিজ। মানুষ রুখে দাঁড়ালে মাওবাদি, মাসি তুমি নিয়মগিরির কথা জানো?

কুন্তলা মাথা নাড়ে। জানে না। মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঝাড়া হাত পা। জানবে কেন? জেনে কী হবে? কিন্তু তাই যদি হয় এই মেয়েটার কথা শুনছে কেন ? শুনতে ভাল লাগছে কেন? নিয়মগিরি পাহাড়ের কথা অতনু কিছু জানে। গোটা পাহাড় নাকি লিজ দিয়ে দিচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিকে। তারা মূল্যবান অ্যালুমিনিয়ম আকরিক তুলবে পাহাড় ফাটিয়ে। কিন্তু পাহাড়ই তো আদিবাসীদের দেবতা। তারা দেবতাকে ধ্বংস হতে দেবে না। জানো মাসি এইসব? অতনুর অদ্ভুত লাগে। মেয়েটাকে এরা কীভাবে মানুষ করছে? সুশান্ত আর বহ্নিশিখা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, স্বপ্ন পূরণ হয়নি। হওয়ার কথাও ছিল না, কিন্তু স্বপ্ন তো মিথ্যে ছিল না। এখন তারা কি না পূরণ হওয়া স্বপ্ন এই পালিত কন্যার ভিতরে চারিয়ে দিয়েছে। মেয়ে সেই চার বছর আগের হেমন্তবেলার মিছিলের কথা শোনায়। মাসি মাসি, তোমরাও নিশ্চয় ছিলে সেই মিছিলে। কে না ছিল মাসি ! আমি তো মায়ের হাত ধরে হাঁটছি। আমাদের আগে আগে পিসে। পিসে কী স্লোগান দিচ্ছিল শুনবে?

গ্রামে গ্রামে ডাক পাঠাও, জোট বাঁধো তৈরি হও……। তোমার নাম আমার নাম, নন্দীগ্রাম নন্দীগ্রাম।

শুনতে শুনতে শিহরিত হয় অতনু। মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই চল্লিশ বছর আগের কথা। মিছিল মিছিল মিছিল আর মিছিল। সে মিছিল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। তার বাড়ি এল সুশান্ত। গ্রামে চল। লিখবি তো দেশ দেখবি না ? হায়! কীভাবে মুছে দিয়েছিল সে তার প্রতিটি লেখা। বিপ্লবের গান, ইস্পাত, মা, পৃথিবীর পাঠশালায়……। লেখা বন্ধ করে দিল সে। চাকরি। বিবাহ। সন্তান। সে যখন জেলখানার পাশের রাস্তা দিয়ে রিকশায় চেপে ববি দেখতে যাচ্ছে রাতের শো-তে, তখন জেল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে সুশান্ত। মাথা নত হয়ে গেছে অতনুর। কী জিজ্ঞেস করবে মেয়েটাকে? কী বলবে? কিছুই না মনে আসায় জিজ্ঞেস করল সেই কতকাল আগের পড়া বইয়ের কথা, লতা তুমি বিপ্লবের গান পড়েছ ?

চিন চিং মাই, পড়েছি মেসো। লতা বলল।

দারুণ তাই না? অতনু ভুলেই গেছে সেই চিনা উপন্যাসের কথা, কিন্তু নামটি ছিল মনের ভিতরে কোথাও ধুলোচাপা হয়ে। বইটি তার কাছে ছিল। টিউশনির টাকায় অমন কত বই কিনেছে তখন ? চিন চিং মাই, গোরকি, শেচেদ্রিন, নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি, লু-সুন, কত সব ম্যাগাজিন। রেড বুক। সব একরাতে ভস্ম করে দিয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় তখন মধ্যরাতে পুলিশের কড়া নাড়া। ঢুকে পড়েই ওয়ারেন্ট ছাড়া সার্চ। বাতাসে কত কথা ভেসে আসছিল, চিন, রুশ বই থাকলেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কোন বাড়িতে নাকি তলস্তয়ের ইভান ইলিচের মৃত্যু বইটি পেয়েছিল, তুলে নিয়ে গিয়েছিল বোবা ছেলেকে। বইটি ছিল তার বাবার। সমস্ত রাত ধরে বোবা ছেলেটিকে জেরা করেই চলেছিল, বল শুয়ারের বাচ্চা ইভান ইলিচ কী করে মরল? কারা মারল। বৃদ্ধ ইভান ইলিচের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, মৃত্যু শয্যায় শায়িত ইভান ইলিচ নিজের সমস্ত পাপের কথা স্মরণ করেছিল সেই কালজয়ী উপন্যাসিকায়। বোবা ছেলের বাবা বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু গোঁয়ার সাব-ইনসপেক্টার বুঝতেই চায়নি। তার তখন কোটা পুরতে হবে। উপরওয়ালা যা চায় তা সেও চায়। তার নিজের কোনো বিচার বিবেচনা, বুদ্ধি প্রয়োগ নেই। থানায় শেষ অবধি এক ডেপুটি কমিশনার বইটির কয়েক পাতায় চোখ বুলিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিল বোবা ছেলেটিকে। তারা প্রথমে ভেবেছিল যুবকটি বোবার অভিনয় করছে । রুশ চিন আর লাল মলাটের বই থাকলেই, চল শুয়ারের বাচ্চা। প্রিয় বইগুলিকে পুলিশের ভয়ে ভস্ম করে দিতে কি কষ্ট হয়নি? কিন্তু রাতের কড়া নাড়ার ভয়ে তো তখন ঘুম হত না। কে যেন উপদেশ দিয়েছিল বাজারে প্রচুর পিন আঁটা পরনোগ্রাফি, অশ্লীল ছবির বই পাওয়া যাচ্ছে, তা কিনে এনে ঘরে রেখে দিতে। হ্যাঁ, বাজার ছেয়ে গিয়েছিল সেই সব বইয়ে। নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির ইস্পাত, চিন চিং মাই-এর বিপ্লবের গান আর লু-সুনের ম্যাড ম্যান'স ডায়েরি বইয়ের পাল্টা এসব এসেছিল বাজারে। সুন্দর জীবন, জীবন যৌবন, যৌবন জ্বালা ঘরে পেলে পুলিশ ফিরে যাবে ভালো ক্যারাক্টার সারটিফিকেট দিয়ে। লতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভস্মীভূত সেই সব বই আবার যেন ফিরে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ইস্পাত, মাদার, লোয়ার ডেপথ, ম্যাড ম্যান'স ডায়েরি……। বিপ্লবের গান পড়েছে লতা, এই বাড়িতেই আছে ৪০ বছর ধরে। কিন্তু লতা বলছে, বিপ্লবে কি পুরুষই সব ? বাড়িতে ছেলেই সব মেসো ? ছেলে হয়েছে বলে কত আনন্দ। মেয়েদের যেন কোনো দাম নেই। বিপ্লবের গান উপন্যাসে আছে যে, যখন ছেলের সংখ্যা দুই, জীবনে আর দুঃখ কই?

শুনতে শুনতে কুন্তলা বলল, ঠিকই তো, কিন্তু গোরকির মাদার ?

লতা বলল, গোরকির মাদার খুব ভালো মাসি, পৃথিবীর পাঠশালা, আমার ছেলেবেলা, চেলকাশ……, দারুণ। তাকে সব পড়াতে শুরু করেছে সুশান্ত। আসলে এসব বই সুশান্তর ছিল। সে এতকাল ধরে রক্ষা করেছে। একটি বইও ভস্ম করেনি। করবে কী করে, ওই সব বই যে আগুনে পোড়ে না, পোকায় কাটে না, তাইই বলছে সুশান্ত। শুনে অতনুর মাথা হেট হয়ে গেল। হায়, নিজেকে বাঁচাতে সে বইগুলি এক সন্ধেয় পুড়িয়ে দিয়েছিল। লুকিয়ে যে রাখবে, ভরসা ছিল না। পুলিশ ঠিক বের করে ফেলবে। বাড়িতে লাল মলাটের গীতা পেয়ে সি আর পি পেটাতে পেটাতে প্রবীণ ব্যক্তিকে ভ্যানে তুলেছিল এই কথা রটে গিয়েছিল। বই দেখেই নকশাল চিনছে পুলিশ।

বইয়ের প্রসঙ্গ বদল করে দিল অতনু। তার কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছে সে যে পাপ করেছে তার চিহ্ন বুঝি দেখতে পাচ্ছে সুন্দরবন থেকে শহরে আসা এই কন্যা। তার সংগ্রহে অমন কোনো বইই আর ছিল না। পরে আর সংগ্রহ করার কথা ভাবেইনি। কীভাবে তার জীবন চলে গেল বই বাদ দিয়ে। অদ্ভুত ! বইয়ের প্রতি আগ্রহই চলে গিয়েছিল যেন। চাকরি করেছে। আইনের বই পড়েছে। আদেশ, নির্দেশ,, প্রজ্ঞাপন, আইনের নানা ব্যাখ্যা এইসব পড়েছে। আইনের নানা ধারা উপধারা পড়েছে মন দিয়ে। মুখস্ত করেছে যেন। আইনে বেঁধেছে সাধারণ মানুষকে। ধনীকে কোনো আইনই কিছু করতে পারে না। তাদের মেয়ে তেমন কোনো বইই পড়ে বড় হয়ে ওঠেনি। সে পড়ত জনপ্রিয় সাহিত্য। বাংলা নয় ইংরিজি। পাল্প লিটারেচর। ইউজ অ্যান্ড থ্রো। ওই সমস্ত বইয়ে ভয় ছিল না। তাদের মেয়ে অদ্রিজা শোনেইনি ইস্পাত কিংবা বিপ্লবের গান-বইয়ের কথা। তারা বলেওনি। এখন মনে পড়ছে তাদের বাসাবাড়ির ছাদে বসে আগুনে বই দেওয়ার সেই সন্ধ্যার কথা।

বস্তুতসব হয়েছিল যেন। কিন্তু কী উত্তাপ সেই আগুনের। গা যেন পুড়ে যাচ্ছিল। ভস্ম হওয়ার আগে তাদের গা থেকে সহস্র সূর্যের আগুন বেরিয়ে এসেছিল যেন। বই থেকে মন সরিয়ে নিতে অতনু জিজ্ঞেস করল, কলকাতা কেমন লাগছে লতার?

লতা বলল, মিছিল মিছিল আর মিছিল।

লতা বলছে দু বছর আগে নন্দীগ্রামে সূর্যোদয়ের পরে সেই চোদ্দই নভেম্বরের কথা। কত বড় মিছিল। অত মানুষ সে আগে কখনো দ্যাখেনি। তাদের মথুরগঞ্জে অত লোক নেই। গোটা সুন্দরবনে অত লোক নেই। মনে হয় কলকাতা শহরেও অত লোক নেই। তাহলে তারা এসেছিল কোথা থেকে?

কোথা থেকে আসবে, কলকাতা আর আশপাশের মানুষ। কুন্তলা বলেছিল।

লতা মাথা ঝাঁকায়। তার মাথায় ঈশেন কোনে সেজে ওঠা মেঘের মতো চুল। সেই চুল যেন ঝাপটা মেরে ভেঙে যায়। সে হাত নেড়ে নেড়ে বলে, শহরের মানুষ সকলে তো রাস্তায় নামেনি মাসি। পথের ধারে কত মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। দুপাশের বাড়িতে কত মানুষ। উচু উচু বাড়ির ব্যালকনিতে মানুষ। জানালায় মানুষ। অফিস কাছারি তো শূন্য হয়ে যায়নি মাসি। সবই ছিল। অথচ এক সমুদ্র মানুষ পথে। মিছিল হাঁটছে। হাজার হাজার মানুষের পা। হাজার হাজার মানুষের মাথা। মাসি তোমার নিশ্চয় মনে আছে ফুল পড়ছিল দুপাশের বাড়ি থেকে ?

কুন্তলা জানে না। ছিলই না তো এই শহরে। চুপ করে শোনে। শুনতে শুনতে দেখতে পায় বুঝি।

শাঁখ বাজছিল মাসি। মিছিলে আবার এসে মিশছিল নতুন মানুষ। এত মানুষ, যেন যত মানুষ আছে আর যত মানুষ নেই, সবাই হাঁটছিল। কী বলছে লতা তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে কুন্তলার। যত মানুষ নেই মানে? মানে পিসের মা, পিসের বাবা, বহ্নিশিখার মা, বাবা,, পিসের বন্ধুরা, যারা নেই, সেই যে কমরেড আনন্দ মন্ডল, সেই যে হুগলি জেলে পুলিশের গুলিতে হত কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ, বহরমপুর জেলে খুন হওয়া কবি তিমিরবরণ সিংহ , বেলেঘাটা বরানগরের লাশ, গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া লাশ, মরিচঝাঁপিতে পুলিশের হাতে মরা রিফিউজি, কুমিরমারি আর মরিচঝাঁপির মধ্যের গাঙে ডুবিয়ে দেওয়া নৌকোর মানুষ, মাসি সবাই হাঁটছিল বুঝি। হাঁটছিল হাঁটছিল। আমি জানিই না, আমার ঠাকুদ্দা নিতাইহরি, বাবা বলাইহরি, মা পুষ্পরানি, ঠাকমা যমুনারানি, সবাই হাঁটছিল। না হাঁটলে অত মানুষ হয় না। মরিচঝাঁপির সব মানুষ এসেছিল মাসি। কবিতা বলছিল তিমির, দ্রোণাচার্য, মাসি শুনছ ?

শুনছি রে শুনছি। বলল কুন্তলা।

তোমার সব মনে আছে মাসি?

কুন্তলা বলেছে, আছে রে আছে।

তখন আমি অত বুঝিনি মাসি, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কে?

কুন্তলা শিহরিত হচ্ছে শুনতে শুনতে। তাকে কিছুই বলেনি কোনোদিন অতনু এইসব কথা। এমন কথা। তার পিসীর মেয়ে তুলিদি জেল খেটেছিল অনেকদিন। নক্সাল আন্দোলনে ছিল। ধরা পড়েছিল বিহারের কোন গ্রাম থেকে। তুলিদি এখন ইউ,কে, থাকে। তার স্বামী এক বিজ্ঞানী। তুলিদির কথা সে তো কোনোদিন বলেনি অতনুকে। লতা বলল, আমি যার পাশে হাঁটছিলাম, সে বলল, তার নাম তিমিরবরণ।

তারপর? কুন্তলা জিজ্ঞেস করে।

মাসি তোমার মনে নেই তিমিরবরণ কবিতা বলছিল মিছিলে, তুমি শোনোনি?

তুই বল দেখি লতা।

লতা বলল, তিমিরবরণের কবিতা শোনো, বলতে বলতে হাঁটছিল আমার হাত ধরে,

‘ও পাগল, ও পথ তুই মাড়াসনে মাড়াসনে
ও পাগল, পাগলামি তুই ছাড়
ঘরে তোর মুমূর্ষু বোন
পাগলামি তুই ছাড়
বল তো
শহীদ হওয়া কি আমাদের পোষায়?

কুন্তলার চোখে জল এসে গেল, বলল, তুই শুনেছিলি?

হ্যাঁ মাসি, তাই, তখন আর একজন হাঁটছিল সামনে, একজন বলল, ঐ দ্যাখো, উনি সরোজ দত্ত।

দম আটকে এল অতনুর, কী বলছে মেয়েটা! বলছে তিনি হাঁটছিলেন কবিতা আবৃত্তি করতে করতে, তাঁর আগে এক ঝাঁকড়া চুলের মানুষ, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, কে বলল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়……।

তারপর ? চোখে জল এসে গেল কুন্তলার।

বহ্নিলতা বলল, কতজনকে চিনলাম সেই মিছিলে! দ্রোণাচার্য, তিমির থেকে রাবণ সোরেন, সায়েবমারি বাস্কে, বনবিহারী, সেই বনপাহাড়ের দেশের রাজকন্যা ভানুমতী, নর্তক ধাতুরিয়া, রাজা দোবরু পান্না, বিভূতিবাবুর দেশের মানুষজন অবধি, কত মানুষ যে হেঁটেছিল!

চোদ্দ

স্কাইপে কথা হয় মেয়ের সঙ্গে। কম্পিউটারের মনিটরের সামনে কুন্তলা বসে আছে। মনিটরে মেয়ের ফ্ল্যাট। এখন এদেশে ফাল্গুন মাস। ওদেশে এখনো শীত। মেয়ে ফোনে বলেছে, মা সানডেতে তুষারপাত হবে আবার, স্নো ফল।

কুন্তলা বলে, সারাদিন বসে তুষারপাত দেখবি ?

হ্যাঁ, মা, উইথ ঘোস্ট স্টোরিজ। অদ্রিজা-মুনাই বলে।

তোর কাছে বাংলা বই নেই তো।

না মা, যে বই এনেছিলাম সব পড়া হয়ে গেছে। মুনাই বলল।

কুন্তলা বিড়বিড় করে, কী বই নিয়ে গেছিলি যেন?

মুনাই বলে, ঐ তোমার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভালবাসার গল্প, বেশিরভাগ গল্পেই ভালবাসা নেই মা।

কুন্তলা বলে, ওদেশে তো বাংলা বই পাওয়া যায়।

মেয়ে বলে, কোথায় পাওয়া যায় আমি জানি না মা।

কুন্তলা তাঁর কন্যার ফ্ল্যাট দ্যাখে। নাতি ডিগবাজি দিয়ে তাকে দেখাচ্ছে, কেমন শিখেছে সে। প্রাণবান শিশু। কুন্তলা বলে, তুই ওদেশে টলস্টয়, গোরকি, অস্ত্রোভস্কি, লু-সুনের বই পাবি না ?

পেতে পারি, খুঁজতে হবে, কেন মা ? মুনাই জিজ্ঞেস করে।

তুই পড়বি। কুন্তলা বলল।

মেয়ে হেসে ফেলে, আমার ওসব পড়তে ভাল লাগে না মা, খুব কঠিন, শুধু কষ্টের কথা, কিন্তু কেন ?

কুন্তলা তখন সুন্দরবনের মেয়ের কথা ভাঙে। শুনতে শুনতে মুনাই বলে, ইন্টারেস্টিং, একদিন তোমাদের ওখানে ডেক মা, আমি দেখব সুন্দরবনের মেয়েকে, ব্ল্যাক টাইগ্রেস।

টাইগ্রেস হবে কেন, খুব ভালো মেয়ে, ব্ল্যাক নয়, শ্যামলা, আচ্ছা আমি ডাকব, হ্যাঁরে বই তো সব ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। কুন্তলা বলে।

আমার ইচ্ছেই করবে না মা, আমার ভাল লাগে হরর, থ্রিলার, আমি ফেসবুকে একটা পেজ খুলেছি, সেখানে শুধু ঘোস্ট, উইচ, ব্লাড সাকারদের কথা লেখা হয়, সুন্দরবনে উইচ আছে তো।

জানি না, কী সব বলিস যে ! কুন্তলা রাগ করে।

ভূত, ডাইনি, রক্ত চোষা বাদুড়, ড্রাকুলা, সুপার ন্যাচারাল লাইফ, আমি চারটে মৃত মানুষের ফেসবুক চালাই মা। অদ্রিজা বলে, মা তোমরা এস, আমি তোমায় শিখিয়ে দেব, তুমি হররের ভিতরে প্লেজার পাবে।

তুই একটু পড়াশুনো কর মুনাই। কুন্তলা বলে।

মুনাই মানে অদ্রিজা বলে, আমি অফ টাইমে লাইফ আফটার ডেথ নিয়ে কথা বলি আমাদের ফেসবুক গ্রুপে।

এসব করে কী হয় মুনাই ? কুন্তলা বলে, তুই ম্যাড ম্যান'স ডায়েরি পড়, লু-সুন।

মুনাই হাসে, ওসব অবসোলিট মা, এখন আর ওসব কেউ পড়ে না, সে সময় চলে গেছে।

তুই কি লাইফ আফটার ডেথ বিশ্বাস করিস?

কেন মা ? মুনাই জিজ্ঞেস করে।

তোর হাজব্যান্ড একজন বিজ্ঞানী।

তাতে কী হয়েছে, ও - ও আছে আমাদের গ্রুপে, তুমি যদি দেখতে কী দারুন সব লেখে ও, ভূত, ডাইনি, ব্লাড সাকার এইসব নিয়ে যে পেজ, তা ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছে মা। অদ্রিজা বলতে বলতে থামে, গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবে, বলে, তুমি হঠাৎ এসব নিয়ে কথা বলছ কেন ?

তখন কুন্তলা বলে, বহ্নিলতার কথা যদি শুনতিস তুই।

কী কথা তুমি বল না। অদ্রিজা বলে, আচ্ছা পরে বলো, মা আমাদের নতুন গাড়ি আসছে নেক্সট উইকে, এখন রাখি মা, বেরোতে হবে।

কুন্তলা বলতে চেষ্টা করে মেয়েকে, কিন্তু বহ্নিলতার কোনো কথা বলাই হয় না ভালো করে। বিপ্লবের গান, শুনে হা হা করে হাসে অদ্রিজা, বলে, ওসবের কোনো সম্ভাবনাই আর নেই মা, বাবার ওই বন্ধুর কথা তো আমি শুনিনি আগে।

অতনু বলে, আমার কলেজের বন্ধু, ও বিপ্লবী ছিল, জেল খেটেছে বহুদিন, খুব ভাল বন্ধু আমার।

অদ্রিজা বলল, ঐ মেয়েটাকে একদিন স্কাইপে আসতে বলো, ও কি নেট করে না, ফেসবুকে নেই?

আছে বহ্নিলতা। বহ্নিলতার সঙ্গে কদিন বাদে দেখা হয় তাদের, সে বলল, সেও একটা পেজ চালায়, তার নাম " মানুষের মুখ "।

কী লেখা হয় সেই পেজে ? কুন্তলা জিজ্ঞেস করে।

দেশের মানুষের কথা, মানুষের কথাই সেখানে লেখা হয় মাসি, মানুষের লড়াই করে বেঁচে থাকা, মানুষের উদারতা, মানুষের যত গুণের কথা, খারাপ মানুষের কথা লেখা হয়, তবে তা সকলকে সাবধান করতে।

হ্যাঁ, লতার মা বহ্নিশিখা বলল, সে-ও আছে সেই গ্রুপে, সেখানে কত রকম মানুষের কথাই না থাকে, যারা প্রতি নিয়ত যুদ্ধ করে বেঁচে আছে,লতা সুন্দরবনের মানুষের কথা লেখে, নিয়মগিরির হিলসের উপজাতিদের লড়াইয়ের কথা লিখেছে সেখানে, মরিচঝাঁপির কথাও লেখে তার ঠাকুমার বয়ানে।

কুন্তলা বলল, তুমি ইন্টারনেটে আমার মেয়ে অদ্রিজার বন্ধু হতে পারো লতা, ইউ,এস,এ থাকে, ক্যালিফোরনিয়া সিটি।

শুনে সেই মেয়ে মুখ উজ্জ্বল করে বলল, বাহ, আমাদের গ্রুপে বাংলাদেশের ঢাকার মেয়ে লিলি ইসলাম আছে, কুমিল্লার পারভেজ হোসেন আছে, ইউ,এস,এ-র একজন আছে, চামেলি পারভিন, কিন্তু আসলে সে বাংলাদেশের, দিদি ইউ,এস,এ-র ব্ল্যাকদের কথা লিখুক।

কিন্তু হলো না। অদ্রিজার ফেসবুকে গিয়ে তার লেখা পড়ে লতা বলল, এইসব সুপার ন্যাচারাল বিলিফ, আমি তো এসব জানি না মাসি, বিশ্বাস করি না, আমি এসবের বিপক্ষে লিখব।

আহা, ওসব ওর খেয়াল, এমনি লেখে, তুমি কি ভূতের গল্প পছন্দ কর না?

লতা বলল, সে তো গতখালির ভূতের গল্প মাসি, কিন্তু তা গল্পই, কিন্তু ওঁর ঐ পেজে তো বিশ্বাসের কথা লিখেছেন উনি, সকলেই নাকি উইচ ক্রাফট বিশ্বাস করে, এই বিশ্বাস থাকলে উনি কি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, এসব হলো জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া।

না, ঠিক তা নয়, আসলে ও একা থাকে তো, সারাদিন করবে কী ?

যাদের অনেক থাকে তারা কি এইসব বিশ্বাস করে মাসি, ডাইনি সন্দেহে কত নারীকে খুন করা হয় আমাদের দেশে, আমি তো তা জানি, তুমিই বাঁচিয়েছিলে না মা একজনকে?

বহ্নিশিখা ঘাড় কাত করে, হ্যাঁ, বাঁচিয়েছিল বহ্নিশিখা। বীরভূমের গ্রামে। কত বোঝাতে হয়েছিল। জমি গ্রাস করতেই তাকে ডাইনি সব্যস্ত করেছিল আত্মীয় এক মোড়ল। বহ্নিশিখার যুক্তির কাছে হার মেনেছিল লোকটা। তাকে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছিল গ্রামের মানুষ কমরেডরা। কতকাল আগের কথা তা। কিন্তু এত বছর বাদে, এই একবিংশ শতাব্দীতে সেই বিশ্বাস ছড়িয়ে যাচ্ছে ফেসবুক পেজ থেকে? কু সংস্কার, আর অন্ধকারাচ্ছন্ন মনের কথা সেই আমেরিকায় বসে অতনু কুন্তলার মেয়ে একটা অনলাইন পেজ খুলে প্রচার করছে। ডাকিনী তন্ত্রে বিশ্বাসের কথা প্রচার করছে।

মুখ অন্ধকার হয়ে গেল কুন্তলার। তার মেয়ের সঙ্গে বন্ধুতাই করবে না লতা। বাড়ি ফিরে মেয়ের ফোন পায় কুন্তলা। সে বলল, তুই ওইসব কি লিখেছিস, তোর সঙ্গে বন্ধুতা করবে না লতা।

অদ্রিজা, মুনাই হাসে, বলল, না করবে তো আমার কী, আমি সুন্দরবনের সুপার ন্যাচারাল কিছু ঘটনা খুঁজছিলাম মা, ওকে, পেয়ে যাব, কেউ না কেউ আছেই, দেখি বাংলাদেশের কেউ যদি লেখে।

কী লিখবে ? কুন্তলা জিজ্ঞেস করল।

ডাকিনীর কথা, ওসব দিকে খুব আছে।

তুই এসব ছাড় মুনাই, তুই ওর বন্ধু হ। বলল কুন্তলা।

মা, পরে তুমি বিশ্বাস করবে এসবে, এসব আছে, আছে, আমি যে যে মরা লোকের নামে ফেসবুক পেজ চালাই, তাদের প্রত্যেকের আন-ন্যাচারাল ডেথ, আমার অ্যাবসেনসে তারা তাদের কথা লিখে যায় তাদের পাতায়, আছে মা আছে, সবই আছে ।

কুন্তলা কাঁদল গোপনে। মেয়েটা এমন হয়ে গেল কেন? অতনু বলল, ও কিছু না, মজা করে তোমার সঙ্গে, ভালোই তো আছে।

কুন্তলা বলল, না, নেই।

কেন কী হলো ?

কুন্তলা বলে, এক বিজ্ঞানীর বউ, সে কি না ভূত প্রেত নিয়ে মাথা ঘামাবে, ডাকিনী তন্ত্রে বিশ্বাস করবে।

অতনু বলল, তাতে হয়েছে কী, ও দেশে নানা রকম কাজ হয়।

তুমি দ্যাখো লতাকে, সে কী করছে, সে তো সুন্দরবনের মেয়ে, কিন্তু কত কিছু ভাবতে পারে, আমাদের মেয়ে তো অমন করে ভাবতে পারত।

অতনু বলল, মেয়ে কেন আমরাই তো ভাবতে পারতাম, কিন্তু আমি তো ভাবিনি, আমি তো গ্রামে যাইনি, অসফল বিপ্লবের কথা ভাবিনি, ঝুঁকি নিয়ে সাহিত্য করতে যাইনি, তাই আমাদের এই ফ্ল্যাট, গাড়ি, ব্যাঙ্কে অনেক লাখ টাকা, সুদ পাই অনেক, খুব ভাল পেনশন, মেয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায়, না হলে বেঁচেই থাকতাম না হয় তো, ওরা যে বেঁচে রয়েছে, বেঁচে গেছে বলে রয়েছে, পুলিশ কম সংহার করেনি, তাদের মধ্যে ওরাও থাকতে পারত।

শুনতে শুনতে কুন্তলা বলে, সবই মেনে নিলাম, কিন্তু ও এইভাবে ভাববে।

অতনু কথা বলে না। ইদানীং মনে হচ্ছে সুশান্তর সঙ্গে শিয়ালদা স্টেশনে দেখা না হলেই বেশ হতো। আড়াই বছর পার হয়ে গেছে তারপর। নিজেকে এখন মনে হয় পরাজিত মানুষ। হেরে গিয়েও শেষ অবধি জিতে গেছে সুশান্ত। অথচ বিপ্লব হয়নি। বিপ্লবী পারটিও ভেঙে ভেঙে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। অস্তিত্বই নেই প্রায়। জীবনে হলো কী? কিছুই না। জেল খেটে ফিরে এসেছে নিঃস্ব হয়ে। সংক্রান্তি পত্রিকা করে, কিন্তু এই বয়সে নতুন করে কিছু আরম্ভ করা যায়? অথচ সুন্দরবনের মেয়েটা এসে শেষ অবধি জিতিয়ে দিল ওদের। মেয়েটার ভিতরে নিজেদের অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষাকে সঞ্চারিত করেছে ওরা। ওরা যা পারেনি তা যেন মেয়েটা করবে। খোয়াব দেখছে। বিপ্লব কি মেয়েরা করতে পারে? মাও-এর দেশে করেছিল না সোভিয়েত দেশে করেছিল ? লতাই তো বলল সেদিন বিপ্লবের গান উপন্যাস পড়ে ওর কী মনে হয়েছে। সুশান্ত আর বহ্নিশিখা বরং মেয়েটাকে বড় করে পাত্রস্থ করার কথা ভাবতে পারত। মিছিল, বিপ্লবের গান, উই শ্যাল ওভার কাম শেখানো কী প্রয়োজন? সেদিন চলে গেছে। আগুনখোর বিপ্লবীরা সব বুড়ো হয়ে গেছে। শুধু শুধু মেয়েটাকে ভুল পথে চালিত করছে। মিছিল, রাজনীতি ও কী বোঝে ? অতনু বলল, মুনাই যেভাবে বড় হয়েছে অমন ভাবতেই পারে, এখন আধ্যাত্মিকতা, অলৌকিকতা, মরণের পরে কী আছে, কেমন হয় সেই জীবন, তা নিয়ে আবার ভাবিত হচ্ছে মানুষ। শুকনো যুক্তিবাদ ফেলে দিয়েছে মানুষ।

লতা কলেজে ভর্তি হয়েছে প্রথম বর্ষে। ওদের পরিবারে ও প্রথম। কেউ কি ভেবেছিল নিতাইহরির নাতনি কলকাতার কলেজে পড়বে? বছরে দু'বার সে গ্রামে যায়। তাকে দিয়ে আসে হয় বিশ্বনাথ গায়েন না হয় সুশান্ত। পরিতোষ মন্ডল তখনো পঞ্চায়েতের সভাপতি। নয় সালে পঞ্চায়েত ভোটে জিতেছিল সে। কিন্তু সে দমে গেছে অনেক। তার পার্টি ক্ষমতা থেকে চলে গেছে দু'বছরের মাথায়। কিন্তু সে তো সুন্দরবনের বাঘ, বাঘ কি বিমর্ষ হয়ে থাকতে পারে। সে তো রক্তের স্বাদ পেয়েছে, রক্ত ছাড়া থাকতে পারে? লতা পুজোর পর ফিরে এসে বলল, মা, রবিদারা সবাই পার্টি বদল করে নিয়েছে, রবিদার কাকা আবার সরকারি দলের হেড।

বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করল, আর কী খবর?

লাল পার্টি উঠে গেছে, ওদের অফিসের সাইন বোরড বদল হয়ে গেছে।

শুনতে শুনতে বহ্নিশিখা হাসে, অদ্ভুত! আর কী খবর ?

গ্রামসুদ্ধ ছাগ-মাংস ভাতের ভোজ দিল পরিকাকা, থানা, বিডিও, সবাই এসেছিল।

আর কী খবর? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

ঠাকমা ছড়া বেঁধেছে,

থলসে পুঁটি কাতলা রুই,
পেইসে ইবার শুকনা ভুঁই।
বারো হাত কাঁকুড়ের
তের হাত বিচি,
তাইলে কেন কোঁদল করো
শুদু মিছিমিছি।

পনের

সুশান্ত দ্যাখে তাদের মেয়েটা অদ্ভুত হয়েছে। তাদের যা ছিল না, এ মেয়ের তা আছে। এ মেয়ে পড়েছে আর জেনেছে অনেক। ইন্টারনেট ওকে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের খবর দেয়। ও যেন পৃথিবীর জন্ম মুহূর্তের সেই বিগ ব্যাং-এর অলৌকিক ধ্বনি শুনতে পায়, ইথার মন্ডলের কম্পন অনুভব করে। খুব ভোরে বড়ে গুলাম আলি বাজেন এ বাড়িতে। হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার বাঁশি বাজে। পিট সিগার, বব ডিলান জানে এ মেয়ে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী শোনে। মেয়েই তাদের পিঙ্ক ফ্লয়েড চিনিয়েছে । ইন্টারনেট ওকে চিনিয়েছে এসব। একদিন ডাকল মেয়ে, মা টু ওমেন দেখেছ ?

চুপ করে থাকে বহ্নিশিখা। দ্যাখেনি তো। লতা, সেই সুন্দরবনের বলাইহরির মেয়ে বলছে, ইতালিয়ান লেখক আলবার্তো মোরাভিয়ার উপন্যাস নিয়ে টু ওমেন সিনেমা করেছিলেন ভিত্তোরিও ডি-সিকা। উনিই বাই সাইকেল থিফ সিনেমা বানিয়েছিলেন। সেই সিনেমা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সত্যজিত রায়।

এসব তুই কোথা থেকে জানলি?

মেয়ে বলল, ইন্টারনেট আর বই, কলেজে সেমিনার থেকে।

আমরা এসব কিছুই জানতাম না। বহ্নিশিখা বলে।

লতা বলল, তোমাদের জানা উচিত ছিল মা, সিনেমাটা ১৯৬০ সালের, দ্যাখোনি কেন?

বহ্নিশিখা বলে, সুযোগ ছিল না রে, বিদেশি সিনেমা কোথায় দেখাত জানি না।

লতা বলল, দেখাত মা, তখন দেখাত, কলকাতায় মেট্রো, এলিট, গ্লোব, লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার, কত সিনেমা হলে বিদেশি সিনেমা দেখাত, এখন সব উঠে গেছে।

তোকে এসব কে বলল? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

জেনেছি মা, যেদিন মিছিলে পা দিয়েছিলাম, সেদিন থেকে জানতে আরম্ভ করেছি , বাড়িতে গিয়ে ঠাকমা, মা, বাবা, দাদুদের শোনাই যখন তারা কেমন হয়ে যায় মা।

কেমন হয় রে ? জিজ্ঞেস করে বহ্নিলতা।

মা তোমায় আমি টু ওমেন দেখাব, গ্রেট সিনেমা, দেখবে যুদ্ধের আতঙ্ক কেমন, যুদ্ধের সময় মেয়েরা কেমন থাকে, মা, যেমন তুমি আমি, তেমনি সেই সিনেমাও মা ও মেয়ের গল্প, দেখলে গা কেঁপে ওঠে, হররস অফ ওয়ার হলো সেই সিনেমা। বলতে থাকে লতা।

বহ্নিশিখা আর সুশান্ত অবাক হয়ে মেয়ের কথা শোনে। তারা তো সুন্দরবনের একটি প্রাণকোষ শহরে নিয়ে এসে বাঁচাতে চেয়েছিল। না আনলে এই মেয়ের হয়তো বিয়ে হয়ে যেত যোগেশগঞ্জ কিংবা মোল্লাখালি, কুমিরমারি। এতদিনে অনেক সন্তানের মা হয়ে ধুঁকত। কোলের সন্তানদের পেটের ভাতের চিন্তায় ঘুম যেত ওর। সেই মেয়ে বলছে আলবার্তো মোরাভিয়া, ভিত্তোরিও ডি সিকা, সোফিয়া লোরেন আর জাঁ-পল-বেলমেন্দোর কথা। অদ্ভুত। বিশ্বাস হচ্ছে না। এ কি সেই বলাইহরির শীর্ণকায় অপুষ্টিতে ভরা মেয়েটি। কাজ করতে গ্রাম থেকে চালান হয়ে এসেছিল তাদের বাড়ি। বিশ্বনাথ গায়েন ছিল বলে এবাড়ি আসতে পেরেছিল। সে নাকি তার মা বাবাকে শুনিয়ে এসেছে এই সব কাহিনি। শুনিয়ে এসেছে পথের পাঁচালির গল্প। অপু দুর্গার কথা। সে নাকি বলে এসেছে মা আর মেয়ের কথা, যুদ্ধের সময় কীভাবে মেয়েটি ধর্ষিতা হয়েছিল সৈন্যদের দ্বারা। কী কথাই না বলছে, মা, যুদ্ধ বলো, দাঙ্গা বলো, সামাজিক বিপর্যয়ের সময় মেয়েদের উপরই শোধ তোলা হয় সব। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষাধিক নারী ধর্ষিতা হয়েছিল খান সেনা আর তাদের দালাদের হাতে।

বহ্নিশিখা বলে, দেখা দেখি সিনেমাটা।

কম্পিউটার খুলে ইউ টিউব থেকে ১৯৬০-এর শাদা-কালো সিনেমা বের করে মেয়ে। চালিয়ে দেয়। অবাক হয়ে বহ্নিশিখা দ্যাখে মা আর মেয়ের আশ্চর্য কাহিনি। আকাশে যুদ্ধ বিমান, কাঁপা কাঁপা স্বরে সাইরেন বাজছে। নগরের মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটছে। আবার সাইরেন, অল ক্লিয়ার। মা তার সদ্য কিশোরী কন্যাকে নিয়ে ফিরছে গ্রামে। ট্রেন যেখানে নামিয়ে দিল সে যেন বহ্নিশিখার সেই ফেলে আসা পুরুলিয়া। পাহাড়, ঢেউ খেলান মাঠ প্রান্তর। রাখালিয়া বাঁশি একবার যেন বেজে থেমে গেল। সামরিক বাহিনির ট্রাক ছুটছে। আকাশে এক একবার যুদ্ধ বিমানের ঝাঁক। ভাষা ইতালীয়। কিন্তু অবোধ্য মনে হচ্ছে না কিছুই। বহ্নিশিখা দেখতে দেখতে ভাবে এ যেন তার আর তার মেয়ের কাহিনি, যা একদিন, সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঘটেছিল। বহ্নিশিখার মনে হয় তারা, মা আর মেয়ে সেই দেশে ছিল সেই সময়। দেখতে দেখতে বহ্নিশিখার চোখ জলে ভেসে যায়।

মা মা, কাঁদছ কেন? লতা জাপটে ধরে বহ্নিশিখাকে।

বহ্নিশিখা বলে, কী দেখালি তুই ?

লতা বলল, এই পৃথিবীতে কত কত ভাল সিনেমা, গান, নাটক, আছে মা, কত ভাল ভাল বই লেখা হয়েছে, আমার মনে হয় কিছু মানুষ সব দূষিত করে দিচ্ছে, ভালো মানুষ, শিল্পীর সংখ্যা কম নয়।

কলেজে তুই কী করিসরে ?

আমাদের একটা গ্রুপ আছে, আমাদের একটা দেওয়াল আছে, সেখানে আমরা আমাদের কথা লিখি। লতা বলতে থাকে।

কী লিখিস? বহ্নিশিখা খোঁজ নেয়।

নিয়মগিরির আদিবাসীদের দেবতাকে প্রণাম, দেবতা এখন মানুষের সহায়তা চান, মানুষ তাঁর পাশে দাঁড়াক।

বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে, এই লেখার মানে কী ?

মানে নিয়মগিরি হলো উপজাতিদের দেবতা, তাকে রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করতে হবে মানে, নিয়মগিরি খনন করে বক্সাইট আকরিক তোলা চলবে না।

আর কী লিখিস ?

আমাদের কথা লিখি মা, অন্যদের কথাও, ক্যানিঙে এক সদ্য বিবাহিত কন্যা পুড়ে মরেছে, অপরাধী স্বামী, এখনো ধরা পড়েনি, বউটির শ্বশুর এলাকার নামী মাছ ব্যবসায়ী, আমরা গ্রেপ্তারের দাবী করেছিলাম। বলল লতা।

তারপর ? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

অবশেষে অপরাধীকে ধরেছে পুলিশ। মেয়ে বলল, কিন্তু মা, পুড়ে মরা বউটার বাপের বাড়ির উপর চাপ আসছে খুব।

বহ্নিশিখা বলে, তোরা যে লিখিস, কেউ কিছু বলে না ?

বলে মা, পুলিশের কাজ পুলিশ করবে, আমাদের কাজ পড়া। লতা হাসতে হাসতে বলল।

কে বলেছে এই কথা ?

প্রিন্সিপাল। লতা জবাব দেয়, মনে হয় চাপ আছে প্রিন্সিপালের উপর।

মা মেয়ের কথা শোনে কুন্তলা। কুন্তলাকে টু ওমেন সিনেমা দেখায় লতা। দেখতে দেখতে কুন্তলা বলে, আমি বুঝতে পারছি ভয়াবহ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, আমার ভয় করছে লতা।

ভয় তো করবেই মাসি, এই সিনেমা হলো হররস অফ ওয়ার, যুদ্ধের সময় এমন ঘটে থাকে।

আমাদের দেশে এমন যুদ্ধ হয়নি। বলল কুন্তলা।

পাশের দেশে হয়েছে, বাংলাদেশে, মরিচঝাঁপির মানুষকে শিক্ষা দিতে এমন হয়েছে মাসি। লতা বলতে থাকে, তার ঠাকুমা জানে সব, শহীদ ক্যাম্প, মানা ক্যাম্প থেকে মরিচঝাঁপি, যুদ্ধের সময় এমন হয়ে থাকে।

কিন্তু সেগুলো তো যুদ্ধ ছিল না। কুন্তলা বলে।

যুদ্ধের চেয়ে কম কিছু ছিল না মাসি, আসলে যুদ্ধ সব সময় মেয়েদের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে। লতা বলতে থাকে, যুদ্ধের আতঙ্ক সব সময় জীইয়ে রাখা হয়। লতা বোঝায়।

কুন্তলা বাড়ি ফিরে মেয়ের ফোনের জন্য অপেক্ষা করে। ফোন আসে সেই দূর পশ্চিম থেকে। ফোন এলে কুন্তলা বলে, তুই টু ওমেন দেখেছিস মুনাই?

সেটা কী মা ? মুনাই-অদ্রিজা জিজ্ঞেস করে।

কুন্তলা বলে কী দেখেছে। শুনতে শুনতে খিলখিল করে হাসে মুনাই, আমি তো যুদ্ধ চাই মা, ওয়ার পিকচার দেখতে আমার দারুণ লাগে, সোলজাররা যখন একটা শহরে ঢোকে মার্চ করতে করতে, উফফ, শহরের লোক কেমন ভয় পেয়ে যায়, আতঙ্কে কী করবে ভেবে পায় না, দারুণ সব সিনেমা আছে মা, মোটেই হরর নয় যুদ্ধ।

তোকে আমি বোঝাতে পারব না।

মুনাই বলে, তোমাকেও আমি বোঝাতে পারব না মা,তুমি ওদের সঙ্গে মেশা বন্ধ করো, পুজো-পাট করো, কিছু লোক থাকে, তারা সব সময় এই সব করে, সোলজার তো দ্যাখেনি। হিসহিস করে বলে মুনাই।

তোর এত রাগ কিসের ? কুন্তলা জিজ্ঞেস করে।

রাগ না মা, তোমাকে কী সব ভুলভাল বোঝাচ্ছে, তুমি এখন মৃত্যু চিন্তা করো।

কী বলছিস তুই, মুখে কিছু আটকায় না। কুন্তলা ফোন কানে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

মা তুমি রেগে গেছ তো, শোনো আমার কথা, দ্যাখো এই জীবনে মৃত্যুই একমাত্র সত্য, আর সব মিথ্যা, মৃত্যুর কথা ভাবলে চঞ্চল হবে কম, ওইসব টু ওমেন-টেন দেখবে না, কী হবে দেখে, সুস্থ শরীর ব্যস্ত হবে, মৃত্যু নিয়ে ভাবলে এইসব ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে মানুষ, পার্থিব জগতের প্রতি মায়া কমে যায়।

কুন্তলা ফোন কেটে দেয়। কী সব বলছে ! মেয়েটা কেমন হয়ে গেল! কেমন। তারা কি এমন ভাবে ওকে বড় করেছে ? ইস্কুল, কলেজ, টিউশন, সবই তো আর পাঁচটা মেয়ের মতো। পাড়ার একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম হয়েছিল। পুলিশ দিয়ে ভয় দেখিয়ে তবে ছেলেটাকে পাড়া ছাড়া করিয়েছিল অতনু। পাড়া মানে লেক টাউন। তখন তারা ওখানে একটা বড় সরকারী ফ্ল্যাটে থাকত। অতনুর সরকারি পরিচয় কাজে লেগেছিল। পুরো পরিবারই নাকি চলে গিয়েছিল এলাকা ছেড়ে। তারা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তার বছরখানেক বাদে বিয়ে। বিদেশ যাত্রা। একেবারেই নিশ্চিন্ত।

অতনু শুনল সব। হেসে বলল, মুনাই ঠাট্টা করেছে, আচ্ছা ওই লতা যা করবে মুনাইকে তা করতে হবে কেন, তুমি কেন ওই সিনেমা দেখার কথা বলেছ, লতার ফার্স্ট জেনারেশন আর আমাদের ফোরথ জেনারেশন, লতা যা দেখছে তাতেই কেঁপে যাচ্ছে, মুনাইয়ের তা হবে কেন?

কুন্তলা বলল, তুমি ঠিক বুঝছ না, আমার দারুণ লাগে মেয়েটার কথা।

অতনু বলে, ওইসব কথা শুনতে ভালো, কিন্তু অবাস্তব, সুশান্ত আর বহ্নিশিখা মেয়েটাকে অন্যভাবে বড় করতে পারত, ওরা নিজেরা তো কিছুই করল না জীবনে, মেয়েটাকে সেই পথে ঠেলছে, আমি বলেছিলাম, বহ্নিশিখা বলল, তারা কিছুই বলেনি, মেয়ে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠেছে, এইটা যে স্বাভাবিক নয় তা ওরা কবে বুঝবে ?

তাইই তো, কবে বুঝবে মেয়ে নিজে? যা করছে ভালো করছে কী ? ক্যানিঙের সেই বধূ হত্যাকারী স্বামী আর তার শ্বশুর আদালত থেকে জামিন পেয়ে গেছে পুলিশ প্রকৃত ধারায় চার্জশিট জমা না দেওয়ায়, কেস হালকা করে দেওয়ায় এই হয়েছে। সাতটি কলেজের ছেলে মেয়ে সব চলে গিয়েছিল বউটির বাপের বাড়ি সোনারপুরে। তারা খুব ভয়ে আছে। মেয়ে তো মরেছে, তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তারাও মরবে, বাড়ি জ্বালিয়ে উচ্ছেদ করে দেবে। রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে বউয়ের বাবাকে মেরে দেবে। ভাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাপিস করে দেবে। শাসানি দিচ্ছে অপরাধী। । লোক পাঠাচ্ছে। কেস তুলে নিতে বলছে। খুব চাপ। তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে মা। সোরগোল উঠে গেছে এর ভিতরে। আরো সোরগোল হবে। অপরাধী শাস্তি পাবে না, তা হবে না, তা হবে না। শুনতে শুনতে বহ্নিশিখা বলে, কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না। তোরা আর কী শ্লোগান দিচ্ছিস ?

আমরা তুলেছি সোরগোল । সবাই মিলে ক্যানিঙ বোল ক্যানিঙ বোল।

আর নেই শ্লোগান? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।
আছে, বলল লতা।

সোনারপুর ডাক দিয়েছে, আগুনে পুড়ে বউ মরেছে।
ও বউ তুই ফিরে আয়, ন্যায় চাইছি, ন্যায় ন্যায়।

কে লিখেছে এই সব? জিজ্ঞেস করে বহ্নিশিখা?
কেন যমুনাবুড়ি। হেসে মাকে জড়িয়ে ধরে লতা, যমুনাবুড়ির শ্লোগান।

ষোল

সোরগোল চলছিল। খবরের কাগজ টেলিভিশন খবর পেয়েছিল। বউ মরেছিল পণের দাবী না মিটতে। সে ছিল আষাঢ়-শেষের খবর। তখন বৃষ্টি নামেনি। মাঠঘাট পুড়ছিল, চাষবাস বন্ধ হয়ে ছিল। তারপর শ্রাবণের মাঝামাঝি আকাশে মেঘ এল, বৃষ্টি আরম্ভ হলো। কিন্তু সেই বৃষ্টির ক্ষমতা ছিল না ক্যানিঙে জ্বলে ওঠা আগুন নেভায়। অপরাধীরা জামিন পেয়ে শাসিয়ে যাচ্ছে, সোরগোল বাড়ছে। টেলিভিশনে লতা, আর তার দুই বন্ধু দীপ্য এবং চন্দ্রিমা সাক্ষাৎকার দিল, বলল, এই অন্যায়ের বিহিত চাই, যুদ্ধে নেমেছি, জিততে চাই। ভাদ্র মাস গেল। আশ্বিন এল। এবার ঝড়-বাদল তেমন হয়নি। ধান হয়েছে ভালো। পুজো আসছে। পুজোয় মেয়ে বাড়ি যাবে। বহ্নিশিখা আর কুন্তলা লতার সঙ্গে গেল পুজোর বাজারে। পুজো মিটলে আবার সোরগোল আরম্ভ হবে। এবার ছাত্ররা পথে নামবে। বউয়ের একটা চার বছরের ছেলে আছে। সে বলছে তার মায়ের গায়ে তেল ঢেলে আগুন দিয়ে দিয়েছে বাবা। মাকে যখন মারছিল বাবা, সে বাবার পায়ে ধরেছিল। বাবা কথা শোনেনি, মায়ের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে দিয়েছে বাবা। ছেলে এখন দাদু-দিদিমার কাছে। সেই-ই হবে বড় সাক্ষী।

আশ্বিনের শারদ প্রাতে লতা চলল বাড়ি। সঙ্গে গেল সুশান্ত। সে আর বিশ্বনাথ গায়েন মেয়েকে হাসনাবাদের ডাঁসা নদী পার করে ট্রেকারে তুলে দিল। মথুরগঞ্জের লোক পেয়ে গিয়েছিল লতা। আর অসুবিধে তো নেই। ট্রেকার পৌঁছবে লেবুখালি।

সেখান থেকে ভুটভুটি নৌকো। সেই নৌকোয় ভান্ডারখালি হয়ে দুলদুলি। দুলদুলি থেকে ট্রেকারে করে মথুরগঞ্জ বাজার। ঠিক পৌঁছে যাবে। মোবাইলে কথা বলে যাচ্ছে লতা। চিন্তা করো না। আমি তো বড় হয়ে গেছি পিসে। তুমি আজই ফিরে যাও। দশমীর দিন এস হাসনাবাদ। টাকিতে ইছামতি নদীর জলে বিসর্জন দেখ। দুই পারের ঠাকুর জলে দেওয়া হয় ওই দিনে। দশমীতে আমাদের মথুরগঞ্জে মেলা বসে। এমনি মেলা, আমার ছোটবেলার মেলা। পাঁপড়ভাজা, জিলিপি, কদমা, কটকটি ভাজা। আমি একাদশীর সকালে হাসনাবাদ ফিরে তোমাদের সঙ্গে কলকাতা। কলকাতায় অনেক কাজ। আবার হবে সোরগোল। সোরগোল সোরগোল।

কলকাতা থেকে আসার সময় ট্রেনে বসে সুশান্ত লতাকে বলেছিল, এবার একটু থামতে হবে, পড়াশুনো।

পড়াশুনোয় কোনো ক্ষতি হবে না পিসে, তুমি কি চাও না আমি এই অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়াই? লতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

সুশান্ত জবাব দিতে পারেনি। কিন্তু তার চিন্তা হচ্ছিল। এই মেয়ে তাদের রক্তের কেউ না। কিন্তু তাদের যৌবনকালের কথা মনে পড়াচ্ছে বারবার। আর তাই সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে ক্রমশ। তার উদ্বেগের খবর বহ্নিশিখাও জানে না। খুব গোপন তা। বলাইহরির মেয়েকে পালন করছে তারা। সে যেন ভালো থাকে। বলাইহরির মেয়ে যদি তাদের হাতের বাইরে চলে যায়, যেমন গিয়েছিল তারা তাদের বাবা মায়ের কাছ থেকে সেই সত্তর দশকে, সে কি ভালো হবে? বলাইহরি তাদের দোষ দেবে। গরিবের কি বিপ্লব করা সাজে, যে বিপ্লব কোনোদিন হবে বলে সন্দেহ আছে। মেয়েটা চাকরি করে তাদের পর্ণকুটির পাকা করবে, ছাদ পাকা করবে, তাদের দ্বীপ থেকে নিয়ে যাবে মূল ভূখন্ডে, বসিরহাট, বারাসত কিংবা কলকাতায় আস্তানা করবে একটা। বাড়ি হবে। কিন্তু লতা যে পথে হাঁটতে আরম্ভ করেছে, সেই পথ কি মসৃণ? খুব কঠিন রাস্তা। সুশান্ত জানে। তারা তো ব্যর্থ মানুষ। একদিন অতনু আর সে আলাপে বসেছিল অতনুর ফ্ল্যাটে। অতনুই তাকে দেখিয়ে দিয়েছে, লতা কোন পথে হাঁটছে। অতনু জিজ্ঞেস করেছিল, এর পরিণাম কী? অন্যের মেয়ে পালন করতে এনে, এই পথে যেতে দেওয়া কি ঠিক? নিজেদের অচরিতার্থ বাসনা পূরণ কি এই ভাবে হয়? মেয়েটার ভালো বিয়ে হোক। বিদেশে চলে যাক চাকরি নিয়ে। এখন অনেক সুযোগ। মেয়েটা তাদের পরিবারকে টেনে তুলুক। আসলে সুশান্ত তার মনের কথা শুনতে পেয়েছিল অতনুর কাছে। সেদিন কুন্তলা ছিল তাদের বাড়ি। সে গিয়েছিল অতনুর ওখানে তার ফ্ল্যাট দেখতে। সুশান্ত তার অচরিতার্থ বাসনাই পূরণ করতে চায় বহ্নিলতার ভিতর দিয়ে। সেই বাসনা হলো এক শান্ত জীবন। বহ্নিলতা এক সফল শান্ত জীবন অর্জন করুক। সব বন্ধুর ছেলে মেয়েরা যেমন জীবনে পা ফেলেছে বহ্নিও তেমন ফেলুক। কেরিয়ার গঠন করুক। হ্যাঁ, তিমিরবরণের কবিতাই তো সত্য,

> ‘ও পাগল, ও পথ তুই মাড়াসনে মাড়াসনে
> ও পাগল, পাগলামি তুই ছাড়
> ঘরে তোর মুমূর্ষু বোন
> পাগলামি তুই ছাড়
> বল তো
> শহীদ হওয়া কি আমাদের পোষায়?

কিন্তু তিমির ওই পথেই গিয়েছিল। মরেছিল। তবুও গিয়েছিল।

ফোনের টাওয়ার চলে গিয়েছিল। তখন সে লেবুখালি থেকে দুরন্ত গাঙে ভেসেছে হয়তো। আর কথা হয়নি। আসলে সুশান্ত বুঝতে পারছিল না তার এই কন্যা বহ্নিলতা কতটা যাবে ? তাদের মতো কঠিন জীবন গ্রহণ করবে নাকি বলাইহরির মেয়ে ? বলাইহরির সঙ্গে বিশ্বনাথ গায়েনের যোগাযোগ সেই মরিচঝাঁপির সময় থেকে। বিশ্বনাথ তাদের মথুরগঞ্জে প্রতিষ্ঠা করেছিল তখনকার রাজনৈতিক নেতাদের বলে। সকলে তো উদ্বাস্তুদের বিপক্ষে ছিল না। বরং ছিল পক্ষে। কিন্তু ভয়ে পুলিশ আর মূল ভূখন্ডের রাজনৈতিক নেতা আর মস্তানদের বিপক্ষে দাঁড়াতে পারেনি। তখন ধর্ষণ হয়েছিল। উদ্বাস্তু পরিবার সমেত নৌকো ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাঝ গাঙে। বিশ্বনাথ গায়েন সব জানে। সবাই সব জানে। কিন্তু ছাই দিয়ে বিষ্ঠা চাপা দিয়েছে যেন। বিশ্বনাথ বলল, চিন্তা নেই, ঠিক চলে যাবে। ওকে তো অভ্যাস করতে হবে। বড় হয়েছে। একা যাওয়া আসা করলে সাহস বাড়বে।

লতা লেবুখালি থেকে ভুটভুটি নৌকোয় চাপল। মথুরগঞ্জের মধ্যবয়সী শ্রীনাথ মন্ডল খুব খুশি লতাকে দেখে। কত ভাগ্য মেয়ের। কলকাতার কলেজে পড়ছে। বাবা মা, দাদু ঠাকুমা, ভাইয়ের জন্য পুজোর নতুন বস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে। শ্রীনাথ বলল,

এবার ধান হয়েছে ভালো। নষ্ট হয়নি একটুও। ভালো ধান মানে সব ভালো। খেজুর গাছে রস আসবে, আম গাছে মুকুল আসবে, শিমুল গাছে ফুল ফুটবে, তুলো হবে। আবার আম ভালো হলে পরেরবার ধানও ভালো হবে। আমে ধান, তেঁতুলে বান। ধান ভালো হলে, খেজুর গাছে রস হবে, রস থেকে পাটালি হবে, গুড় হবে। এমনি আশা নিয়েই তো চাষা বাঁচে। আবার নতুন আশা হয়েছে লতা। বহ্নিলতা দুলদুলি পৌঁছে টাওয়ার পায় ফোনে। মাকে ফোন করে, হ্যাঁ, মা, বহ্নি মা, আমি দুলদুলি এসে গেছি, এবার ট্রেকারে উঠব। সঙ্গে শ্রীনাথ কাকা রয়েছে, চিন্তা করো না। আমি বাড়ি পৌঁছে আবার ফোন করব।

হ্যাঁ, পিসে, আমি মথুরগঞ্জে এসে নামলাম। চিন্তা গেল তো? মিষ্টি আমি দুলদুলি থেকেই কিনে নিয়েছি, রসগোল্লা। মাকে আমিই ফোন করছি।

লতা ব্যাগ হাতে বাড়ির পথ ধরেছিল। এখনো অনেকটা বেলা। বাড়ির পথটি ছায়াচ্ছন্ন। রোদ আর ছায়ার ঝিলমিল। কোথাও শুধুই ছায়া, রোদ পড়ে না তেমন। তখন নাইন বুলেটস ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল রবিদা, রবি মন্ডল, হাত তুলে ডাক দিল, হাই লতা, এলি?

লতা দাঁড়ায়। রবিদার গালে পাতলা দাড়ি। চুল উলুরঝুলুর। বুকে “লাভ মি” লেখা টি- শার্ট গায়ে। জিনস, পাওয়ারের শু। গলায় সোনার চেন চকচক করছে। কব্জিতে স্টিলের বালা, হাতে তিন রকম আংটি। রবির বেশ পেটানো শরীর। চোখ ঈষৎ লাল। হেসে হাত মেলায়, এলি?

হ্যাঁ, তুমি কেমন আছ, বি,এ, হয়ে গেছে?

রবি বলল, না, ড্রপ দিয়েছি, পরেরবার হবে, তুই কেমন আছিস লতু?

ভালো আছি, মৌমিতার বিয়েতে আসতে পারলাম না।

এলি না, মস্তি হতো খুব, ও থাকে বারুইপুর, সোনারপুর, বারুইপুর, ক্যানিঙ।

উঁহু, বারুইপুর ডায়মন্ড হারবার লাইন, সোনারপুর থেকে ক্যানিঙ যায়।

তুই তো সব জানিস, জানবিই তো। বিড়বিড় করল রবি।

লতা বলল, আমি আসি রবিদা।

দাঁড়া, এই তুই বেশ বড় হয়ে গেছিস, হেব্বি। রবি হেসে বলল। জিভ ঘুরিয়ে নিল ঠোঁটে।

তুমিও বড় হয়ে গেছ। বলতে বলতে গা শিউরে উঠল যেন। যেতে চায় লতা।

রবি বলল, আসিস আমাদের বাড়ি।

যাব, মৌমিতা আসবে ?

রবি বলল, জামাইও আসবে, ওরা কাশ্মীরে হানিমুন করে এল।

বাহ, আমি কলকাতায় ফিরে কথা বলব, নম্বরটা দিও তো। লতা বলল।

নবমীতে আসবে বলেছে, নিয়ে নিস। রবি বলল।

লতা বলল, আমি খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু উপায় ছিল না আসার।

খবর দিয়েছিল তার বাবা ফোন করে। পঞ্চায়েত সভাপতির ভাইঝি, রবির বোনের বিয়ে, তাকে আসতে বলেছে খুব করে। এই তো আষাঢ়েই বিয়ে হলো। তখন সোনারপুরের মেয়ে পুড়ে মরেছে ক্যানিঙে। সে আসবে কী করে? সোনারপুর জংশন থেকে এক লাইন বারুইপুর হয়ে ডায়মন্ডহারবার, আর এক লাইন ক্যানিঙ। মথুরগঞ্জে তখন কেনই বা আসবে? কলেজও কামাই হবে। রবি বলছে, এবার দশমীর মেলায় কলকাতা থেকে নাচের জুটি, উর্বশী আর লালজি আসবে। বড় বাজেট। তার কাকা দিয়েছে ওদের খরচ। এবার ফাটাফাটি পুজো। লতা শুনতে শুনতে হাঁটতে লাগল। রবি বলল, তাকে দেখতে সত্যি ভালো হয়েছে, শাঁসে জলে বেশ বেড়ে গেছে সব!

ইসস, এইভাবে বলে নাকি? বলতে গিয়েও বলে না লতা। পঞ্চায়েত সভাপতির ভাইপো, তাকে দেখছে ছোট থেকে। এদের কথা এমনি। বলতে জানে না। ভাষাবোধ কম।

ফরসা হয়েছিস। কলকাতার কলের জলে ফরসা হয় শুনেছি। রবি আবার বলল।

হাসল লতা, কিছু বলল না। কী বলবে? ফরসা হোক কালো হোক, তার কিছু যায় আসে না। এসব নিয়ে মাথাই ঘামায় না। কিন্তু রবিদাকে তো বলা যায় না। সাড়া না পেয়ে রবিদা আবার হাত মিলিয়ে চলে গেল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে লতা ভাবে, উর্বশী আর লালজি? ইস! তারা ডুয়েট গায় আর ডান্স করে। সঙ্গে এক্সট্রা কিছু মেয়ে থাকে, এলোমেলো নাচতে। তারা বার ডান্সার। টু-পিস পরে নাচে। অরুচিকর। রবিদা এদের আনল কেন, দশমীর মেলায় তো এমন হতো না। বড় জোর যাত্রা। বেশিরভাগ বড় পর্দা টাঙিয়ে উত্তম সুচিত্রার সিনেমা। পুজোর সব দিনই তা দেখান হয়। হিন্দি হয়েছে কয়েকবার, আরাধনা, কাটি পতঙ্গ…, পুরোন দিনের রাজেশ খান্নার সিনেমা।

মা, বাবা, ভাই, ঠাকুমা আর ঠাকুরদা অপেক্ষা করছিল তার জন্য। হৈ হৈ পড়ে গেল। গাছে দোয়েল শ্যামা ফিঙে নাচতে লাগল, গাইতে লাগল। শিস দিতে লাগল হলুদ পাখি। ডোবায় খলসে, পুঁটি, মৌরলা, চাঁদা মাছের দল লাফালাফি করতে লাগল। ফড়িং এখান থেকে উড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে বসতে লাগল। দূর গাঙে কে যেন গান ধরল, মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে……, বাড়ি এল বাড়ির মেয়ে।

ভাই ইলেভেন। ভাইয়ের পড়ার খরচ বিশ্বনাথ গায়েন দেয়। ভাই বলল, বিচিত্রানুষ্ঠানের রাত্তিরে স্পেশাল কিছু হবে, অ্যাডাল্ট। সে শুনেছে তাই।

ইস, গ্রামে হবে ?

হ্যাঁরে দিদি, সভাপতি মত দেছে, ছেলেছোকরার আনন্দ হবে, মথুরগঞ্জে আনন্দ করার কী আছে।

লতা বলল, তুই এসবে থাকবিনে।

আমারে যে ভলেন্টিয়ার করেছে।

না, চলে আসবি আমার সঙ্গে। লতা বোঝায় ভাইকে, এর প্রতিবাদ করা দরকার।

ভাই বলল, তুই কথা বলবিনে, সভাপতি মত দেছে যখন, কার কী বলার আছে?

লতা বুঝল, তাই। সভাপতি তার পুরোন ক্ষমতা আবার অর্জন করেছে। মাঝখানে কিছুদিন মরমে মরে ছিল। রবিদাও তাই। তারপরই সব ঠিক হয়ে গেল। সভাপতি আগের মতো হয়ে গেল। রবিদা একটা হল খুলেছে, ভিডিও দেখায়, সব অ্যাডাল্ট সিনেমা।

তুই দেখিস নাকি? লতা জিজ্ঞেস করেছে ভাই পুণ্যহরিকে। ভাই মাথা নাড়তে থাকে।

খবদ্দার দেখবি নে। লতা শাসন করে ভাইকে।

বাইরে তখন নিবিড় অন্ধকার জমে মহাগাঙ। মহালয়া গিয়ে তৃতীয়া সবে। পঞ্চমীতে ঢাক বাজবে। উদ্বোধন করবে সভাপতি আর থানার ওসি এবং বিডিও। কলকাতার মতো হবে সব। সেদিন থেকে আলো জ্বলবে জেনারেটরে পথে পথে। হ্যাঁ, ঝিকিমিকি টুনি লাইট। এইসব কথা হয় ভাই বোনে। রাত বাড়ে। লতার মনে হয় ভাইটা না খারাপ হয়ে যায়। ভিডিওয় খারাপ সিনেমা দেখেছে কি না কে জানে ?

সতের

ভাই পুণ্যহরি রবি মন্ডলের পিছনে ঘোরে। না ঘুরলে উপায় নেই। যত বড় হবে ততো ঘুরতে হবে। এখন পুজোর ভল্যান্টিয়ার। লতা গ্রাজুয়েট হয়েই একটা চাকরি খুঁজবে। সে সাইকোলজি পড়ে। কিছু একটা হয়ে যাবে আশা করে। না হলে টিউশনি করবে। অঙ্ক জানে ভাল। সায়েন্স সাবজেকট পড়াতে পারবে। তখন ভাইকে কলকাতা যদি নিয়ে যেতে পারে। ভাইয়ের খরচ সে দেবে। পিসে আর মা নিতে চাইবে না, কিন্তু দেবে। পুজো এসে গেল। মাইক বাজল। আলো জ্বলতে লাগল প্যান্ডেলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মিস উর্বশী আর লালজির প্রোগ্রামের কথা ঘোষণা করল সভাপতি পরিতোষ মন্ডল। খুব হাততালি পড়ল। সিটি বাজল। এমন পুজো আর কখনো হয়নি মথুরগঞ্জে। উদ্বোধনের পর রবি খবর দিল, মৌমিতারা আসবে না। ওরা আসতে সেই কালীপুজো। খুব ধুমধাম করে কালীপুজো হয় মন্ডলবাড়িতে। এবার আরো জোর হবে। ২১টা ছাগ বলি হবে। গাঁ সুদ্ধ লোক খাবে মাংস ভাত। পঞ্চায়েত চাল দিয়েছে। কত খবর গ্রামের। মোবাইল ফোন চার্জ দিতে হয় বাজারে গিয়ে। ভাই দিয়ে আনে। ফোনে সব জানায় লতা তার বহ্নি মাকে। প্রতিদিন ফোন করতে হয়। না করলে বহ্নিশিখা আর সুশান্ত অধীর হয়ে ওঠে। কী মায়ায় পড়েছে যে। এই যে সে বাড়ি গেছে মথুরগঞ্জে, সব খালি হয়ে গেছে। বাড়িতে যেন কোনো প্রাণ নেই। মেয়ে বলল, ভাইয়ের খুব পছন্দ হয়েছে জামা প্যান্ট। মা শাড়ি পরে আজ অষ্টমী পুজোয় অঞ্জলি দিয়েছে, বাবা পাঞ্জাবি আর পায়জামা একবার পরেই বাড়িতে ফিরে ভাজ করে রেখে দিয়েছে। যমুনাবুড়ি তার লালপেড়ে শাড়ি বুকে চেপে ধরছে শুধু। বলছে আগের জন্মে তোমরা বুড়ির মেয়ে জামাই হতে----হি হি হি।

বহ্নিশিখা বলে, ফোনটায় শব্দ হচ্ছে খুব।

লতা বলে, গাঙের ঢেউ মা, না হলে জঙ্গলের গাছের পাতার শনশনানি।

বহ্নিশিখা বলে, এইবার ঠিক হয়েছে।

লতা বলে, দশমীর পরের সকালেই আমি ফিরে যাব, ভ্যান রিকশায় দুলদুলি, তারপর বোট।

আয়, আমরা থাকব হাসনাবাদ ঘাটে, তুই অষ্টমীতে কী পরলি ?

তোমার দেওয়া শালোয়ার কুর্তি, দশমীতে পিসের দেওয়া লং স্কারট পরব মা।

পরিস, খুব ভালো রঙ ওটার।

নবমী গেল। দশমীতে খুব হৈ হৈ লাগল গাঁয়ে। বিসর্জন যাবে চতুর্দশীতে। স্টেজ বাঁধা হয়েছে বড় করে। ভাই এসে খবর দিল, সে যাচ্ছে দুলদুলি, উর্বশী আর লালজিকে নিয়ে আসবে মথুরগঞ্জে। সঙ্গে অবশ্য রবিদা আছে। পাঁচটা মোটর বাইক যাবে নিয়ে আসতে। আগে তারা, পিছনে ট্রেকারে উর্বশী আর লালজি এবং সম্প্রদায়। লতা বলল, তোকে যেতে হবে না ভাই।

রবিদা বলল যে নিয়ে যাবে।

লতা বলল, তুই বল দিদি বারণ করেছে, আমি তো কাল চলে যাব, আজ তুই বাড়ি থাক ভাই।

ভাই পুণ্যহরি শেষ অবধি গেল না। রবি তাকে যেতে বলেনি। সে ম্যানেজ করেছিল রবির সাগরেদ দিলুকে। গেল না দেখে দিলু চলে গেল দুলদুলি তার বাইক হাঁকিয়ে। বিচিত্রানুষ্ঠানে সন্ধ্যায় রবীন্দ্র নজরুলগীতি। তারপর নাটক রূপভান পালা সংক্ষেপিত। নতুন করে লিখেছে বরুণহাটের দিলীপ গায়েন। রাত এগারটার পর উর্বশীদের অনুষ্ঠান। যত রাত হবে মথুরগঞ্জে ফুর্তির মৌতাত বাড়বে। বিকেলে টাকি থেকে ফোন করল বহ্নিশিখা। তারা বিসর্জন দেখতে এসেছে। লতা খবর দিল, দশমীর মেলা বসেছে মথুরগঞ্জে। সে সন্ধে বেলায় মেলা হয়ে গান শুনতে যাবে। সন্ধের অনুষ্ঠান ভাল। রূপভান, সোনাভানের গল্প জান মা, আমি গিয়ে বলব। বহ্নিশিখা বলল, আয়, শুনব, ধুর তোরে ছাড়া ভালো লাগে না।

পুজোর সময় মথুরগঞ্জে আলো জ্বলে পুজো প্যান্ডেলের রাস্তায়। মথুরগঞ্জের দশমীর মেলা সুখ্যাত। বহু দিনের পুরোন। আশপাশের দ্বীপ থেকে, ভান্ডারখালি, দুলদুলি, এমন কি লেবুখালি, সন্ডালিয়ার বিল থেকেও লোক আসে। রাতভর অনুষ্ঠান দেখে সকালে ফিরে যায়। অনুষ্ঠান মানে বড় পরদায় সিনেমা। উত্তম সুচিত্রা, প্রসেঞ্জিত দেবশ্রী, মহুয়া, শুভেন্দু তনুজা ,এমনি সব হিরো হিরোইনের সিনেমা।

লতা মেলায় গিয়ে মায়ের জন্য বটি, খুন্তি, হাতা, সাঁড়াশি কিনল। একটা হাঁড়িও। তাকে অনেকটা টাকা দিয়েছিল বহ্নিশিখা। যা কিনতে ইচ্ছে কেনার জন্য, বিশেষত তাদের বাড়ির জন্য। বাড়ি ফিরে এল মা আর মেয়ে। মা কি যাবে মেলায় আবার ? না পুষ্পরানি বাড়ি ফিরে বলল, সিনিমা থাকলে যেত, পেত্যেকবার দুটো সিনেমা দেখায়, এবার নেই।

লতা গেল। ভাই আছে অনুষ্ঠানে। ভাইয়ের সঙ্গে ফিরবে। বেশি সময় থাকবে না। কাল তো সকালেই ফিরতে হবে। পুষ্পরানি শুনতে পাচ্ছিল মানুষের গুনগুন। এবার উর্বশীর নাচ দেখতে বাইরের লোক আসায় ভাটা পড়েছে একটু। বড় পর্দার সিনেমা ছিল প্রধান আকর্ষণ।

লতা গেল বিচিত্রানুষ্ঠানে। গিয়ে দেখল নজরুল গীতি গাইছে একটি তার বয়সী মেয়ে। বেশ গাইছে। কিন্তু মঞ্চের আশপাশে খুঁটিতে খুঁটিতে উর্বশীর টু-পিস পরা পোস্টার। বারমুডা আর ছোট ব্লাউজ। অর্ধ নগ্ন ছবি। সে ভাইকে ডাকল, ভাইরে ভাই।

পুণ্যর বুকে ব্যাচ লাগানো, দিদিকে বলল, সামনে চেয়ার দেব? গেস্ট।

লতা বলল, তুই বাড়ি চ, ইস, এ কেমন সব পোস্টার, গাঁয়ের মেয়েরা বউরা, আমাদের মায়েরা আসবে তো, ছিহ।

পুণ্য বলল, দিদি তুই চুপ কর, কলকাতায় কি এসব হয় না।

ভাই এমন বলে না, রবিদা কই?

ব্যস্ত, উর্বশীদের ওখেনে আছে, গান শোন দিদি, তুই তো আর নাচ দেখবিনে।

গান শুনেছিল লতা। একজন গিটার বাজিয়েছিল। শুনেছিল। ভাই আর ধারে-কাছে নেই। দিদির ভয় আছে। দিদি তাকে ডেকে নিয়ে যাবে। রবিদা খোঁজ করলে পাবে না। তাতে রবিদার বিরাগভাজন হবে সে। রাত হলো। নটা নাগাদ লতা উঠে পড়ল। না, রাত বেড়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে লোক আসছে। গাঁয়ে এমনি হয়। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পরিবার চলে আসে অনুষ্ঠান, যাত্রা কিংবা সিনেমা দেখতে। লতার মোবাইলে টর্চ ছিল। সে চেনা রাস্তা ধরে হাঁটছিল। ভয় যা সাপের। কিন্তু আশ্বিনের অর্ধেক পার হয়ে গেছে। রাতে হিম পড়ছে। সাপেরা ঘুমোতে গেছে। চিন্তা নেই। পথ মিনিট পনের-কুড়ির। প্রধান পথে লোকজন চলছিল। তারপর বাঁদিকে ঘুরল লতা। এই পথ নির্জন। ছায়াময় অন্ধকার। দুপাশে গাছ-গাছালি। বন। কয়েক পা এগোতেই দুজন চলে এল পথে। দুলু আর চাঁদু। মোবাইলের টর্চ মেরে তাদের দেখে নিশ্চিন্ত হলো লতা। কিন্তু তারা যে এসেছে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর থেকে তা টের পায়নি লতা। ঝোঁপ থেকে জন্তুর বদলে মানুষ বেরোল কেন? দুলু বলল, চলে এলি যে, নাচ দেখবিনে ?

কাল আমাকে ফিরতে হবে যে। বলল লতা।

তোকে রবি ডাকছে, দেখা করে যা। চাঁদু বলল।

লতা বলল, এখন না, আমি ফোন করে নেব।

না, তোরে যেতে বলেছে, ফোনে হবে না। বলে দুজন পথ আটকে দাঁড়ায়। তখন লতার কি সন্দেহ হয়েছিল, লেখেনি, সে বলেছিল, পথ ছাড়ো।

ছাড়ব বলে জঙ্গলে বসে নেই এক ঘন্টা। বলতে বলতে ছায়ার মতো চাঁদু এসে তার হাত ধরেছিল, তুই আর গাঁয়ের না, যা বলছি শুনতে হবে।

কী সব বলছ? লতা প্রতিবাদ করেছিল, তার গা ছমছম করে উঠেছিল কি? বদ গন্ধ পাচ্ছিল সে।

তুই কলকাতার মেয়েছেলে, যাবি না তক্কো করবি? দুলু বলল।

সে বলল, বাজে কথা বলো না, হাত ছাড়ো।

হাত ছাড়েনি চাঁদু। লতা ফুঁসছিল। চিৎকার করতে যেতেই তার মুখ চেপে ধরেছিল চাঁদু। দুলু এসে গামছা দিয়ে মুখ আটকে দিয়েছিল। হায় ভগবান! এ তার নিজের গ্রাম। এখেনে জন্মেছে সে। সব মিথ্যে কথা। রবিদার নাম করে তাকে তুলে এনেছে এরা। তারা তাকে নিয়ে গিয়েছিল নাইন বুলেটস ক্লাবে। একটু ঘুরপথে হাঁটতে হয়েছিল। পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছিল কেউ একজন। নাইন বুলেটস আগে খুব ভালো ফুটবল খেলত। চাম্পিয়ন হয়েছিল একবার মহকুমা ফুটবলে। এখন ফুটবল হয় না। সব ইন্ডোর গেম। আর মস্তি। ক্লাবের দোতলা বাড়ি হয়েছে। কিন্তু বাইরে থেকে অন্ধকারে তা থমথম করছিল। লতার মনে হচ্ছিল ছুটে পালায়। কিন্তু উপায় ছিল না। রবিদা জানে না। জানলে এদের কেটে ফেলে দেবে। লতা কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে গেট বন্ধ করে দিল একজন। রবিদা মেলায় রয়েছে। তার সাগরেদদের এত সাহস! কিন্তু ঘরে বসে আছে ও কে ? রবি মন্ডল? মৌমিতার দাদা।

লতা লিখেছে, মা, আমাকে রবিদা বলল, আয়, তোর জন্যি ওয়েট করছি, তুই কলকাতায় কী করিস?

রবিদা তুমি তো আমাকে সকালে বলতে পারতে, আমি কাল যাব, বাড়ি ফিরতে হবে, মা বসে আছে।

তখন রবিদা বলল, আরে যাবি, যাওয়ার আগে খাজনা দিয়ে যাবি, কলকাতায় দিচ্ছিস, আমাকে দিবিনে, দিলু তোরা বাইরে গে পাহারা দে, আমি এরে বুঝে নি।

রবিদা তোমার কথা বুঝতে পারছিনে।

মেয়েটাকে সামলাতে পারলে আবার সব ম্যানেজ হবে। মৌমিতাই বুঝতি হবে না। রবি প্যান্টের বেল্ট খুলছিল। গায়ে কালো স্যান্ডো গেঞ্জি। মুখে ভব ভক করছে লিকারের গন্ধ, রবি বলেছিল, চাম্পি মেয়ে হয়েচিস লতু, উফফ!

রবিদা, এ তুমি কী বলছ, আমি তুমার বোনের মতো, মৌমিতার বন্ধু আমি।

আরে মৌ-ই তো খবর দিল তোর।

রবিদা এ কী করছ তুমি, প্লিজ!

রবি বলেছিল, আরে দিবি শুধু, তুই কলকাতায় কী করে বেড়াস তা কি জানিনে, টিভিতে কীসব বলিস তুই, মৌমিতার বরের মাসতুতো ভাইয়ের বউ মরেছে পুড়ে, তোর কী রে তাতে, ক্যানিঙ যাস তো, ক্যানিঙ, তোরে উচিত শিক্ষা দিতে বলেছে মৌ।

মা তখন আমার গা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। মৌমিতাই খবর দিয়েছে। তার শ্বশুরবাড়ি থেকেই নাকি বলেছে মেয়েটাকে উচিত শিক্ষা দিতে। মৌমিতার বর বলেছে এমন শিক্ষা দিতে যে জীবনে যেন আর কলকাতায় মিছিল করা ক্যানিঙে মিছিল করা, সোনারপুরে………..। কুত্তিটা যেন কলকাতায় না ঢুকতেই পারে। মথুরগঞ্জের মেয়েটার ভার রবির উপর দিয়েছে মৌমিতার শ্বশুর আর জামাই। ওই মেয়েই সব কিছুর মূলে। পুলিশ ম্যানেজ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মিডিয়ায় উঠে সব কেচিয়ে গেছে। পার্টিও সরে গেছে। মৌমিতা তাকে শনাক্ত করেছিল টিভি দেখে। রবিদা বলছিল, জামাই বলেছে ফাটিয়ে দিতে, ও আসতে পারেনি, নইলে ও দেখে নিত তোরে।

মাগো, এসব কী বলছ তুমি! লতা কঁকিয়ে উঠেছিল।

আমারে খাজনা দিয়ে যেতে হবে লতা, যা ফিগার করেছিস, গাঁয়ে না দিয়ে যাবি কোথায়, সব কলকাতায় দিচ্ছিস সে খবর আমি জানি, ওই তোর পাতানো বাপ আর তার বন্ধু তোকে……..।

মা, আমার আর লেখার ক্ষমতা নেই। গায়ে কেন্নো সার দিয়ে উঠছিল। ঘেন্নায় শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। আমার কিছুই করার ছিল না। রবিদার ডাকে দুলু আর চাঁদু এসে আমার হাত পা চেপে ধরল। মুখে গামছা গুঁজে দিল। রবিদা আমাকে শেষ করে দিতে লাগল। মা, মনে পড়ে সেই যে "টু ওমেন" সিনেমা, যুদ্ধের সময় কী হয়েছিল। আসলে যুদ্ধটা যে শেষই হয়নি তা খেয়াল ছিল না। মা, আমি যেন মরে যাচ্ছিলাম। রবিদার পরে তার দুই শাগরেদ, মাগো আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। শেষে রবি আবার এল কামার্ত কুকুর এক। আমাকে যেন পাঁউরুটির মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। তারা যখন গেল তখন উর্বশীর নাচ আরম্ভ হচ্ছে। মাইক ফেটে যাচ্ছিল ভয়ঙ্কর বাজনায় । তার ভিতরে চাপা পড়ে যাচ্ছিল আমার কষ্ট।

আমি সেই অন্ধকারে জামা কাপড় পরে হাঁটতে হাঁটতে………। আমার খোঁজে বেরিয়েছিল বাবা। বহ্নিমা, আমার মনে হচ্ছিল অন্ধকারে চারদিকে সেনাবাহিনির বুটের শব্দ, সাঁজোয়া গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আকাশে যুদ্ধ বিমান। আমার চারধার ঘিরে নিয়েছে সশস্ত্র বাহিনির উল্লাস। আমি অন্ধকারে পথের ধারের যুগী পুকুরের ঘাটলায় নিজেকে ধুয়ে নিলাম। ঘেয়ো কুকুরের গায়ের গন্ধ ঘিরে ছিল আমাকে! বমি আসছিল। ধুয়ে ফেলে বাঁচলাম। মাথায় উঠে এসেছিল দশমীর চাঁদ। আলো ফুটছিল। মা, তখন বাবার ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি কী করব? বউটা পুড়ে মরেছে, তার চেয়েও কি আমার খারাপ হয়েছে ? বেঁচে তো আছি। তুমিও কি থার্ড ডিগ্রির কথা আমাকে শোনাওনি? আরো যা শুনিয়েছিলে তা কি কম কিছু? থান হাজতে কী করেছিল তিন পুরুষ কনেস্টবলে! রবিদার বোন আমার ক্লাস ফ্রেন্ড, আমাকে শনাক্ত করতেই তার উপরে চাপ হয়েছে। হ্যাঁ, সে-ই খবর দিয়েছে সব। তাই। খবর না দিলেও বা কী হতো? আমি বাবার ডাক শুনে চুপ করে বসে থাকলাম। বাবা আর পুণ্য ডাকতে ডাকতে চলে যাচ্ছিল। আমি অপেক্ষা করছিলাম কিছু একটা করার জন্য। কী ? তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। ভিতরটা গরগর করে উঠছিল। আমার মোবাইল ফোন ওরা নিয়ে গেছে। যোগাযোগের উপায় নেই। তারপর রাত আরো বাড়ে। উর্বশীর নাচ বন্ধ হয়। নাচ দেখে দলে দলে লোক ঘরে ফেরে অন্ধকারে। টর্চ, হেরিকেন, কুপি, বিড়ির আগুন অনুসরণ করে আমি গা ভাসিয়ে দিলাম তাদের ভিতরে। একদিকে দুলদুলি, আর একদিকে হাঁটতে হাঁটতে সামসেরগঞ্জ। আমি অন্ধকারে মিশে হেঁটে যাচ্ছিলাম।

সামসেরগঞ্জ শেষ লোকালয়। তারপর ছোট একটা খাড়ি, দ্বীপভূমির শেষ। খাড়ির ওপারে বনের শুরু। বন দেখা যায় ওই। বনের বাতাস বয়ে আসছিল। আচমকা গরগর আওয়াজ শুনল মানুষজন, ভয়ে গুটলি পাকিয়ে গেল। নড়ার ক্ষমতা নেই কাউর, তারা ভয়ার্ত চোখে দেখল, বাঘিনী লাফ দিয়েছে জলে। বাতাসে যতক্ষণ ভেসে ছিল সে ক্রমাগত লম্বা হয়ে যাচ্ছিল। দশ ফুট, বারো ফুট……কী ভয়ানক! তারপর খাড়ির ধারের মানুষ দেখল বাঘিনী সাঁতরে পার হয়ে যাচ্ছে খাড়ি। তারা আতঙ্কে চিৎকার করছিল ওই যে ওই ওই! ওই দেখা যায়, মাথা ভাসিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে গাঙ। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দ্বীপভূমির দিকে তাকিয়ে বাঘিনী ওপারে ঢুকে গেল বনের ভিতরে তা স্পষ্ট দেখা গেল এপার থেকে। আকাশ থেকে তখন আলোর ভাব নেমে আসছে জলতল আর দ্বীপের মাটিতে।

আঠের

মেয়ে মেলা থেকে ফেরেনি। মেয়ের বাবা বলাইহরি, ভাই পুণ্যহরি ছুটছিল এদিক সেদিক। জলসায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? জলসার প্যান্ডেল পড়েছিল জনশূন্য। চেয়ার, তেরপল গুটোনোও হয়নি। বলাইহরি কেঁদে ফেলেছিল খালি জলসার প্যান্ডেলে গিয়ে। তারপর গ্রামের ভিতর ঘুরছিল চাপা গলায় লতাকে ডাকতে ডাকতে। আগেরদিন জলসায় জেগে গ্রাম নিঃঝুম হয়ে পড়েছিল সেই সকালে। গ্রাম একটুখানি নয়। কোথায় খোঁজ করবে? মেয়ে বাড়ি ফেরেনি, সেই কথা তো জনে জনে বলা যায় না। বলাইহরি আশঙ্কায় জন বসতির বাইরে চলে গিয়েছিল। ধান খেতে নেমে পড়েছিল। আল ধরে ঘুরছিল রোদে। আগের বছর গ্রামের একটি যুবক খুন হয়ে পড়েছিল ধান খেতের ভিতর। বলাইহরি উদ্ভ্রান্তের মতো সেই দিগন্ত জোড়া প্রায় হলুদ হয়ে আসা ফসলের খেতে চাপা গলায় মেয়েকে ডেকে বেড়াচ্ছিল। ও লতা, আছিস, লতা মা। বলাইহরির মাথায় মেঘমুক্ত শরতের আকাশ। ঝনঝনে হয়ে উঠছিল রোদ। বলাইহরি ধান খেতের ভিতর ক্রমাগত পাক খেয়ে খেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল মেয়েকে।

পুন্যহরি ফোন করেছিল হাসনাবাদে। বিশ্বনাথ গায়েনের বাড়িতে বহ্নিশিখা আর সুশান্ত অপেক্ষা করছিল বহ্নিলতার জন্য। বিশ্বনাথ শুনে ভয় পেয়েছিল। ঘরপোড়া গরু। এ জীবনে কত দেখেছে সে। বলল, আসছে। সে-ই তাদের নিয়ে থানায় যাবে। তারা একা যেন না যায়। সুশান্ত আর বহ্নিশিখাকে হাসনাবাদে রেখে বিশ্বনাথ মথুরগঞ্জে রওনা হয়েছিল। যদি লতা ফেরে হাসনাবাদে, সে খবর পাবে। বলাইহরি একা থানায় যেতে সাহস করছিল না। পঞ্চায়েতে যাবে, না থানা ? পুণ্য কী মনে করে রবিকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। তার অদ্ভুত এক আশঙ্কা হয়েছিল মনে। রবিদা কি জানবে না? রবিদাকে

বাদ দিয়ে কিছু হতে পারে? রবিদা সব জানতে পারে বলেই লিডার। রবিদাকে বলবে। কিন্তু পায়নি রবিকে। সে ঘুমোচ্ছিল। পরে অনেক বেলায় আবার গিয়েছিল। তখনো শুনেছিল ঘুমোচ্ছে। ক্রমশ রোদ খুব আগুন হয়ে উঠছিল। রবির বাড়ি থেকে ফেরার সময় চাঁদু ধরেছিল তাকে, এই ঘুরচিস কেন, কী হয়েছে ?

রবিদার কাছে গিইলাম। পুণ্য বলেছিল।

দেখা হলো ? চাঁদু জিজ্ঞেস করেছিল। মুখে অদ্ভুত হাসি, তোর দিদি চলে গেছে কলকাতা ?

সে জবাব দেয়নি। চাঁদু জানলেই রাষ্ট্র করে দেবে। চাঁদুকে ছেড়ে সে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল। বিশ্বনাথ যখন মথুরগঞ্জে এসেছিল, সূর্য মধ্য গগনে। তাকে নিয়ে থানায় ছুটেছিল বলাইহরি। সঙ্গে ছেলে পুণ্যহরি। তারা থানায় গিয়ে দ্যাখে ওসির ঘরে বসে সিগারেট মুখে পা দোলাচ্ছে রবি। সব কথা রবিও শোনে। থানার ওসি মন্তব্য করার আগেই সে বলল, চাঁদু আমারে বলেছে সকালে, পুণ্যর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল বোধ হয় সকালে, আমি বললাম, ও পালিয়েছে কাউর সঙ্গে, লাভ অ্যাফেয়ার হবে, কলকাতার মেয়ে, চাম্পি হয়ে গেছে।

পুণ্যহরি অবাক। চাঁদুকে সে কিছুই তো বলেনি। কিন্তু কথাটা থানায় ওসির ঘরে রবিদাকে বলতে সাহস হয়নি। লাল চোখে রবি তার দিকে তাকিয়েছিল। মধ্যবয়সী ওসি বললেন, এর আবার ডায়েরি কী হবে, ফিরে এলে হোমে পাঠিয়ে দেব, কলকাতায় যাদের কাছে থাকত, তাদেরও আসতে হবে, তারা জানে হয়তো মেয়ে আছে কোথায়?

রবি বলল, হুঁ, তাদের নামেও এফ,আই,আর, করো বলাইকাকা, পাচার করে দিয়েছে ঠিক।

বিশ্বনাথ গায়েন বলেছিল, মেয়ে তো এখান থেকে হারিয়েছে।

রবি গর্জন করেছিল, ভোরে যে হাসনাবাদ যায়নি, সে প্রমাণ কী আছে, হাসনাবাদ ফেরার কথা তো আজ। তারা ছাড় পাবে না, আমাদ্দের গাঁর মেয়ে, ছেড়ে দেব না, পারমিশন নিয়ে কলকাতায় চালান করেছিলে ?

বিশ্বনাথ বলেছিল, বাজে কথা বলো না রবি, একটা মেয়ে বাড়ি ফেরেনি, এই গ্রামে এসে ফেরেনি, এইটা আমাদের কথা, এফ,আই ,আর করতে এসেছি।

রবি বলেছিল, ও তো সাতঘাট মারিয়ে বেড়ায়, আমি সব জানি কলকাতায় কী করে, কারা ওরে দিয়ে কী করায়, হাসনাবাদ থানায় খবর দিন স্যার, নয়া বাপ-মা দুটো যেন না পলাতি পারে, বলাইকা, তুমি লেখ সুশান্ত বোস আর তার বউ বহ্নিশিখা বোস, তারা নক্সাল ছিল এককালে, তারা মেয়ে উধাও করে দেছে, আমরা ছাড়ব না।

বিশ্বনাথ গায়েন বলেছিল, আশ্চর্য, তুমি এইভাবে কথা বলছ কেন, এইটা থানা, সরকারের থানা, তুমি কি চাকরি করছ এখানে ?

খবদ্দার গায়েনদা, আমারে চোখ রাঙাবা না, এইটা মথুরগঞ্জ। রবি দাঁত ঘসটে ঘসটে বলেছিল।

আমি তো তোমাকে কিছু বলতে আসিনি রবি, মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এসেছি। শান্ত গলায় বলেছিল বিশ্বনাথ গায়েন।

কেন পাওয়া যাচ্ছে না তা তুমিই বলো, তোমরা কিছু করলে নাকি?

গায়েন জবাব না দিয়ে ওসিকে বলেছিল, স্যার, এফ, আই, আর, নিন।

তখন চোখ রাঙিয়ে রবি বলেছিল, তুমি বহিরাগত, গায়েনদা চলে যাও, তোমার নামে এফ, আই, আর করলে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে।

গায়েন ভীতু লোক নয়, সে বলেছিল, তাই করো রবি, কিন্তু মেয়েটার কী হলো তা জানতেই হবে, গেল কোথায় সে, মেলা থেকে ফিরছিল, বাড়ি ফেরেনি, তোমার রাগের কারণ বুঝছি না তো!

থানা এফ,আই, আর নেবে না নেবে না করেও নিয়েছিল। গায়েনকে থানার ওসি চেনে। হাসনাবাদে এই ওসি মেজবাবু ছিল, সেকেন্ড অফিসার। গায়েনের তেজ দেখেছে সে। অভিযোগ নিয়ে আসার বিরাম ছিল না। পুরোন নক্সালের তেজ যেন ফুরোয় না। কোর্টে চলে যেতে পারে। তিনি আদালতের ভয় করেন খুব। হাইকোর্টের রায়ে নদীয়ার এক ওসি জেল খাটছে। এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুইসাইড করেছে। কোর্টই সব কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ক'বছর বাদে অবসর। ওসি সকলকে হাতে রাখতে চান।

থানা থেকে বেরিয়ে একটু এগোতেই রবির দুই সাগরেদ দুলু আর চাঁদু তাদের দিকে তেড়ে গিয়েছিল, আবে কেটে গাঙে ভাসিয়ে দেব, ভাগ শালা, মেয়েটার খবর না হলি হাসনাবাদে থাকাই হবে না তোর।

পুণ্যহরি বোবা হয়ে গিয়েছিল। কান্নাও আসছিল না ভয়ে। রবিদা অত খেপা হয়ে গেল কেন? দিদি হারিয়ে গেল, তারা থানায় যাবে না? বাতাসে কিছু কথা ভাসছিল। কানাঘুষো শুনেছে পুণ্য। আন্দাজ করে আতঙ্কিত হচ্ছে। রবিদা আর দুলু, চাঁদু অনেকটা সময় মেলায় ছিল না।এইটা সে জানে। তারা ফিরে এসেছিল রাত করে। ভয়ে তার বাবার হাত ধরে পুণ্য বাড়ি ফিরেছিল।

বাড়িতে এসেছিল বিশ্বনাথও। বিশ্বনাথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করেছিল পুণ্যকে। পুণ্য কিছুই চাঁদুকে বলেনি শুনে বিশ্বনাথ বলেছিল, ওরা জানে অনেকটা।

বিচার হবে না বাবা? বুড়ি ঠাকমা যমুনারানি জিজ্ঞেস করেছিল কাঁদতে কাঁদতে, মেয়েডা গেল কনে বাবা?

স্তম্ভিত হয়ে বসেছিল মেয়ের মা। আন্দাজ করছিল ছেলের কাছে থানার কথা শুনে। মাথা ঢলে পড়েছিল মাটির দিকে। কী হয়ে গেল! মেয়েটা এখন কেমন আছে যদি বেঁচে থাকে।

যমুনাবুড়ি কাঁদতে কাঁদতে আবোল তাবোল কী যেন বলছিল,

বনের বাঘিনী হ, মুখে নিয়ে যা,
ছিঁড়ে খা, ছিঁড়ে খা
মা, বনে লিয়ে যা,

বলাইহরি কাঁদছিল,ও মা কী বলো?

যমুনাবুড়ি বিড়বিড় করছিল,

আকাশের বাজ নামুক,
গাঙের তুফান
বনের বাঘিনী আসুক

ছিঁড়ে খাবে বলে।

বলাইহরি চাপা গলায় বলেছিল, থামো মা থামো।

যমুনাবুড়ি থামছিল না,

গাঙের কুমীর হ,

বনের বাঘিনী

উয়ারে ঠেকাবে কেডা

শয়তান বুঝেনি।

বিশ্বনাথ গায়েন হাসনাবাদে ফিরে এসেছিল একা। সুশান্ত, বহ্নিশিখা ছিল অপেক্ষায়। সব শুনে কাঁদতে কাঁদতে বহ্নিশিখা ফিরেছিল কলকাতায়। আবার পরাজয়। হেরে গেল সে। জীবনটা হেরে যাওয়ার জন্যই যেন শুরু হয়েছিল। মেয়েটাকে যদি বাংলাদেশ বর্ডার পার করিয়ে দেয়, গেল কোথায়? পাচার হয়েছে ঠিক। ফোনটা পুকুরঘাটে পাওয়া গেছে। পুকুরে নেমেছিল সে। জলে। কেন? সেই যে সিনেমা, "টু ওমেন" ,মা ধুয়ে দিচ্ছে মেয়ের অপমান। সে কি নিজের অপমান ধুয়ে ফেলতে পুকুর ঘাটে গিয়েছিল ? না কি ডুবে মরেছে ? কত রকম যে মনে আসছিল! হায় হায়। বুক ফেটে যাচ্ছিল তার। সমস্ত পথ কান্নায় ভিজে গেল। অপরাহ্ন শেষে অসময়ে মেঘ এসেছিল এই দেশে। নিম্নচাপের ভ্রূকুটি দেখা দিচ্ছিল। ধান শেষ হয়ে যাবে যদি বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি নেমেছিল।

সাতদিন গেল। তারপর আচমকা এক গভীর রাতে ফোন এসেছিল মুনাইয়ের। পশ্চিম দেশে তখন দুপুর। ফোন পেয়ে কুন্তলা খবর দিয়েছিল মুনাইকে, ও নেই রে, সে নেই, লতা নেই!

মা আমি কতগুলো কথা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দেবে ? মুনাই জিজ্ঞেস করে।

জানলে বলব। কুন্তলা বলেছিল।

তার বাড়ি মথুরগঞ্জে ? জিজ্ঞেস করে মুনাই।

কে বলল তোকে ? কুন্তলা অবাক।

রবি একটা ছেলের নাম ?

হ্যাঁ, পঞ্চায়েত সভাপতির ভাইপো। কুন্তলা বলে।

দুলু আর চাঁদু, দুই সাগরেদ? মুনাই জিজ্ঞেস করে।

তুই জানলি কী করে ? কুন্তলা জিজ্ঞেস করে।

মা, মৌমিতা তার গ্রামের মেয়ে, ক্লাসের বন্ধু, রবির বোন, মৌমিতার বরের মাসতুতো ভাই তার বউ, ক্যানিঙের সেই বউকে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মেরেছে পণের দাবিতে? মুনাই ধীরে ধীরে বলে।

ওরে তুই এসব জানলি কী করে, মনে হয় মেয়েটাকে খুন করে বড় নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে, সে রেপড হয়েছিল হয় তো, তার ভাই শুনেছে কিছু, গায়েনকে বলেছে ভাই পুণ্যহরি। বলতে বলতে কুন্তলা কাঁদে, কী যে হলো!

মুনাই সেই দূর দেশ থেকে বলল, খুন হয়নি মা, আছে সে, আছে।

কে বলল আছে, তোর ভূতপ্রেত ? অসহায়ের মতো বলল কুন্তলা।

ইয়েস মা, বলতে পার তা, আমি নতুন একটা পেজ দেখছি স্যোসাল নেটওয়ারকিং সাইটে, " বাঘিনী, দি টাইগ্রেস" সে কে ? মুনাই জিজ্ঞেস করল।

কী বলছিস তুই, আমি কিছু বুঝতে পারছি না! কুন্তলা কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে।

মুনাই বলে, বিজয়া দশমীর সেই রাতের কথা "বাঘিনী" সব লিখে দিয়েছে পেজে, তাকে কীভাবে রেপ করেছিল রবি, কারণ তার বোনের শ্বশুরবাড়ির আদেশ, সেই মৌমিতাও ভালো নেই, তার স্বামী তাকে চাপ দিয়েছিল, গাঁয়ের মেয়েটাকে রবি শিক্ষা দিক, না হলে মৌমিতাকে খারাপ কিছু ফেস করতে হবে, তারও গায়ে আগুন লেগে যাবে, কিন্তু মা উলটো হয়েছে, ক্যানিঙে আবার মিছিল হবে।

যুদ্ধ গিয়েও যায় না,
যায় না, যায় না, যায় না।
যমুনাবুড়ির নাগাল কেউ,
পায় না, পায় না, পায় না।
ও যমুনা বলে দে
ক্যানিঙের পথ বলে দে।
হোক সোরগোল ক্যানিঙ যাব
গাঙ সাঁতরে পথ দে।
গাঙের বাঘিনী আসছে ওই
গাঙের পারে দেখবি সই।

কী বলছিস তুই, তোর কথা আমি বুঝতে পারছি না, কুন্তলা কেঁদে ওঠে, ওরে মুনাই, ওরা, সুশান্তদা আর বহ্নিশিখাদি আবার হেরে গেল, ইসস, মেয়েটা যে কী সুন্দর ছিল, কী হলো তার, গেল কোথায় ?

মুনাই বলল, বাঘিনীর পেজ দেখছি মা, সে ক্যানিঙের বধূ হত্যার সুবিচার চেয়েছে, ওই শ্লোগান লিখেছে।

কী বলছিস? উত্তেজিত হয়ে ওঠে কুন্তলা।

হ্যাঁ, জামিন পেয়েছে শ্বশুর, তার শাস্তি চাই, বাঘিনী পেজে ত্রিপুরা আসাম থেকে ছত্তিশগড়, ক্যানিঙ, সোনারপুর, মথুরগঞ্জের কথা, মা সে আছে, এই সেই মেয়ে, আমি গেস করতে পারছি মা। মুনাই বলল, স্যোসাল নেটওয়ারকিং সাইট খুলে দ্যাখো, মথুরগঞ্জে রেপ আর ক্যানিঙের বউ পুড়ে মরা নিয়ে সোরগোল লেগেছে। মুনাই স্যোসাল নেটওয়ারকিং সাইট বুঝিয়ে দিতে থাকে কুন্তলাকে।

হতে পারে নাকি, কী বলিস তুই মুনাই। কুন্তলা কেঁদে ফেলল মধ্যরাতে। কেন সেই কান্না, জানে না।

মা, একটা চিঠি আছে সেখানে, সেই রাতের বিবরণ, মথুরগঞ্জ, উর্বশীর নাচ, ক্লাবে নিয়ে গিয়ে রেপ, মা আমি টু ওমেন দেখলাম চিঠি পড়ার পর, বাঘিনীর চিঠিতে সব দেখা যাচ্ছে মা, সোনারপুর ক্যানিঙ, মথুরগঞ্জ, সামসেরগঞ্জ…… মা, আরো কী লিখেছে শোনো, দিস ইজ নট সুপারন্যাচারাল মা ? বাঘিনী মিনস ওমেন ইন পাওয়ার। শোনো মা,

আমরা তুলেছি সোরগোল ।

সবাই মিলে ক্যানিঙ বোল ক্যানিঙ বোল।

বোল বোল বোল ক্যানিঙ বোল

মথুরগঞ্জে সোরগোল।

আর নেই শ্লোগান? কুন্তলা জিজ্ঞেস করে।

আছে, বলল মুনাই।

সোনারপুর ডাক দিয়েছে, আগুনে পুড়ে বউ মরেছে।

ও বউ তুই ফিরে আয়,

ন্যায় চাইছি, ন্যায় ন্যায়।

মুনাই বলল, ইন্টারনেটে সাত সমুদ্র তের নদী সাঁতরে পার হয়ে গেছে বাঘিনী, পৃথিবী জেনে গেছে মথুরগঞ্জে কী হয়েছিল, ক্যানিঙে কী হয়েছিল, শুনছ মা, বিপ্লব হয়ে গেছে মা।

তখন সুন্দরবনের সামসেরগঞ্জ সাঁতরে চলে এল এক বনের বাঘিনী। কৃষ্ণপক্ষের চাপা অন্ধকার রাতে সে ছুটতে লাগল মথুরগঞ্জের দিকে। বনের বাঘিনী কেন লোকালয়ে আসে তা বনের বাঘিনীই জানে। আর জানত বহ্নিশিখা। তাকে মধ্যরাতে ফোন করে কুন্তলা সব বলছে। সব। মুনাইয়ের কাছে যা শুনেছে সব। বহ্নিশিখা বলছে, মুনাইকে ফোন করতে বল, আমি জানতে চাই আমার মেয়েটা কেমন আছে।
